পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতিকেও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিপক্ষীয়দের সঙ্গে বিচারে তিনি বেদবাক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ তন্ত্রাদি হইতেও প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁর প্রতিপক্ষীয়েরা যেসকল পৌরাণিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, রাজা কোথাও তাহার মর্য্যাদা অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু আপনি স্বপক্ষীয় বহুবিধ শ্লোক উদ্ধার করিয়া, শাস্ত্রের দ্বারাই শাস্ত্রকে খণ্ডন করিয়াছেন। অথবা খণ্ডন করিয়াছেনও বলা সঙ্গত হয় না। এরূপ খণ্ডনের দ্বারা শাস্ত্রে স্ববিরোধিতার প্রতিষ্ঠা হয়। আর যাহার মধ্যে এইরূপ সাংঘাতিক স্ববিরোধিতা আছে, যাহা একবার এক বস্তুকে 'হঁা' ও আরবার তাহাকেই 'না' বলিয়াছে, এমন শাস্ত্রের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। এই জন্য রাজা প্রতিপক্ষীয়দের শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধী শাস্ত্র-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। কিন্তু এই আপাত বিরোধের মীমাংসা কোথায়, তাহাও সর্ব্বদাই দেখাইয়া দিয়াছেন। রাজা যদি কেবল শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা শাস্ত্রপ্রমাণ কাটিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ওকালতি করিয়াছেন, এরূপ মনে করিতে পারিতাম। কারণ ইহাতেই তাঁর নিজের পক্ষ সমর্থিত হইত। আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য এদতিরিক্ত কিছু বলা বা স্বীকার বা প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আত্মমত-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সত্য-প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁর বেশী দৃষ্টি ছিল। এইজন্যই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, তারই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র কিরূপে এই বিরোধভঞ্জন করিয়াছেন, অধিকারীভেদে, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট সর্ব্ববিধ উপাসনাই প্রচার করিয়াছেন, কোনও অনুশাসন বা নিম্ন অধিকারীর কোনওটি বা উচ্চতর অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, এই ভাবে রাজা প্রতিপক্ষীয়ের মত গ্রহণ করিয়াও সর্ব্বদাই তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেন এবং এই পথেই শাস্ত্রবাক্যের আপাত স্ববিরোধিতা-দোষ খণ্ডন করিতেন। যে শাস্ত্র মানে না, তার পক্ষে এতটা শ্রমস্বীকার স্বাভাবিক নহে। রাজা শাস্ত্রের

প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। আর এইজন্যই শাস্ত্র-প্রচারে এরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রপ্রামাণ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজা অধিকারীভেদও মানিতেন। অধিকারীভেদে শাস্ত্রানুগত্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রাজা কহিয়াছেন—

শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে—নানাপ্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদিগের প্রতিমাপূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানাবিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী যেমন শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসি প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহাদিগেরও পূজার নিমিত্ত অধিকারীবিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি—

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যেসকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

রাজার সিদ্ধান্তে শাস্ত্র, বিচার ও স্বানুভূতি।

রাজা শাস্ত্র মানিতেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণে বিচারেরও পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও কহিতেন। হিন্দুর শাস্ত্র-বিচারে একথা বলা অনাবশ্যক ছিল। কারণ হিন্দুর শাস্ত্রপ্রামাণ্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর মিমাংসামাত্রেই বিচারের আশ্রয়ে আপনাপন সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি, সমন্বয়, এই পাঁচটি সোপানের উপরেই মীমাংসা গড়িয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টীয়ান্‌শাস্ত্রে এরূপভাবে বিচারের মর্য্যাদা প্রকাশ্যভাবে স্থাপিত না হইলেও, তারও মীমাংসা আছে। খৃষ্টিয়ান্ মীমাংসার নাম Exegetics ও Apologetics; তাহাতেও বিস্তর বিচার আছে। রাজা খৃষ্টীয়ান্ শাস্ত্রের বিচারেও এই

মীমাংসার পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেখানেও তিনি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে স্বানুভূতির বা private judgmentএর দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বহুতর প্রোটেষ্ট্যান্ট্ খৃষ্টীয়ান্ যেভাবে এই স্বানুভূতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, রাজা ঠিক সেভাবে করেন নাই। ইঁহারা শাস্ত্রের উপরে নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ মনোমত করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহা নিজের নিকট সত্য বা সঙ্গত হইল না, তাহাকেই বর্জ্জন করিয়া থাকেন। রাজা ঠিক তাহা করেন নাই। রাজা আমাদের প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলম্বন করিয়া, একদিকে যেমন শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে বিচার ও স্বাভিমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ স্বাভিমতের প্রামাণ্য-নির্ণয়েও তিনি শাস্ত্রের অর্থাৎ প্রাচীনকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের এবং যুক্তির অর্থাৎ সার্ব্বজনীন মনস্তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। রাজার সিদ্ধান্তে শাস্ত্র গুরু এবং স্বাভিমতের একবাক্যতার উপরেই সমুদায় সত্যের ও প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদীগণের মতন রাজা সত্যনির্ণয়ে একান্তভাবে স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া চলেন নাই। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ ইহা করিতে যাইয়াই রাজার পথ হইতে সরিয়া পড়েন। সে কথা ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজার শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে বেদ ও পুরাণাদির প্রামাণ্য।

রাজা আধুনিক আর্য্যসমাজের মতন কেবলমাত্র বেদকেই প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই; পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি ইহুদার ধর্ম্ম-পুস্তক ও খৃষ্টীয়ানের বাইবেল প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে পর্য্যন্ত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধকেরা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতাকেই, ব্রহ্মজ্ঞানের তিনটি প্রস্থানরূপে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু

শাস্ত্রপ্রামাণ্য হিসাবে রাজা এই প্রস্থানত্রয়কে পুরাণতন্ত্রাদির উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। মনুর মত আশ্রয় করিয়া রাজা একথা কহিয়াছেন সত্য যে "যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ"; কিন্তু ইহা "গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম মাত্র।" অন্য পক্ষে হিন্দুদিগের পুরাণতন্ত্রাদিকে, সাক্ষাৎ বেদ না হইলেও "বেদের অঙ্গ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু—

"ইহাও বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই, সেইরূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপ-পুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার এ নিমিত্ত. শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমত নহে। অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে…অতএব সটীক কিম্বা মহাজনধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন।"

আর এইখানেই আমরা রাজা প্রামাণ্য-শাস্ত্র বলিতে কি বুঝিতেন, এবং এই প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়, ইহা অতি পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। প্রথমে যে শাস্ত্রের টীকা আছে, রাজা তাহাকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এখানে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রাদির সম্বন্ধেই এই টীকার কথা কহিতেছেন; বেদ উপনিষদ সম্বন্ধে কহেন নাই। কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসা-দর্শনের দ্বারা বেদার্থ-নির্ণয়ের পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে। এখন বেদের অর্থ কেবল বেদের শব্দেতে কেহ খোঁজে না, লোকে মীমাংসার সাহায্যেই বেদার্থ-নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। জৈমিনি-সূত্র বেদের কর্ম্মকাণ্ডের এবং বাদরায়ণ-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের অর্থ কি করিয়া নির্ণয় করিতে হয়, তার পথ দেখাইয়াছেন। এই পথ ধরিয়া, এই সকল সূত্র প্রয়োগ করিয়াই এখন লোকে বেদার্থের বিচার করে। আর এই সকল মীমাংসার সূত্রও যুক্তি এবং স্বানুভূতির আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাণতন্ত্রাদির মীমাংসা-শাস্ত্র নাই,

কিন্তু টীকা আছে। আর এসকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি, টীকা-কারেরা যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে, পূর্ব্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেসকল পুরাণ-তন্ত্রের টীকা আছে, অর্থাৎ যাহার অর্থ-নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাজা কেবল সেই সকলকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; যুক্তি ও বিচারের কষ্টিতে যার পরীক্ষা হয় নাই, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। এসকল ছাড়া, টীকা না থাকিলেও মহাজনেরা যেশাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, রাজা তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। নিজের অপরোক্ষ অনুভূতিতে সত্যের সাক্ষাৎকার যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, নিজের সাধনের দ্বারা যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাজন। মহাজনেরা পুরাণ-তন্ত্রাদির যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছেন, ইহা সহজেই মানিয়া লইতে পারা যায়। অতএব মহাজনদিগের সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত বলিয়া তাঁহাদের উদ্ধৃত বচনও প্রামাণ্য। শাস্ত্রপ্রামাণ্য সম্বন্ধে রাজার ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই বিষয়টি এইরূপে তলাইয়া দেখিলে, একান্ত-ভাবে সকল শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরে ধর্ম্মবস্তুকে গড়িয়া তুলিতে যাইতেন বলিয়া বোধ হয় না। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ রাজার সিদ্ধান্ত ও মতবাদ হইতে কতটা যে সরিয়া পড়িয়াছেন, পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র সকল প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও, কেন পুরাণ তন্ত্রাদির প্রচার না করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? আবার উপনিষদও অনেক; এসকল উপনিষদের মধ্যেই বা রাজা

কেবল পাঁচখানি মাত্রই প্রকাশ করিলেন কেন? ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্তু কেবল আয়তনের বিস্তৃতি দেখিয়া যে রাজা এ দু'খানির প্রচার ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, এমন কল্পনা করা যায় না। অন্যদিকে, প্রশ্ন-উপনিষদ, তৈত্তিরীয়-উপনিষদ, ঐতরেয় বা শ্বেতাশ্বতর কিম্বা কৈষতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদ প্রভৃতি ত তেমন বড়ও নহে। কিন্তু রাজা এগুলির প্রচারে ও অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহার কি কোনও নিগূঢ় কারণ ছিল?

রাজার বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য।

রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া, আর তাঁর সমসময়ে দেশের অবস্থার আলোচনা করিয়া মনে হয় যে রাজা যে কাজটি করিতে গিয়াছিলেন তাহার জন্য বেদান্ত-সূত্র এবং কেন, কঠ, ঈশ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পঞ্চ উপনিষদের প্রচারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। ঈশ্বরতত্ব ও ধর্ম্মতত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করাই রাজার শাস্ত্র-প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। সকল দিক্ দিয়াই দেশে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। প্রচলিত প্রতিমা-পূজাতে যে লোকের মনে কোনও ভক্তির উদয় হইত না, এমন নহে। কিন্তু এই ভক্তি প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিতে পারিত না, কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই জন্মিত ও বাড়িত। এই কল্পনাশ্রিত ভক্তিও সকলে লাভ করিত না; জনসাধারণে এসকল পূজা-পার্ব্বণের নিতান্ত বাহ্য রং তামাসাই দেখিত ও সম্ভোগ করিত। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এগুলিকে রূপক-রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মূল বস্তুজ্ঞান যার নাই, রূপকের মর্ম্ম ও মর্য্যাদাই বা সে বুঝিবে কিসে? এইজন্য দেবদেবীগণ কেবল অতিপ্রাকৃত কল্পনারূপেই লোকের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। লোকে ভোগলীপ্সার দ্বারা প্রেরিত হইয়াও, এসকল দেবদেবীর পূজা করিত। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরতত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে, যে কোনও উপায়ে হউক, মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ও এই অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক

ছিল। আর এই প্রয়োজনের প্রেরণাতেই রাজা সর্ব্বপ্রথমে বেদান্ত-সূত্র, বেদান্তসার, এবং কেন, ঈশ, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচ-খানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান-প্রতিষ্ঠ।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—বলিয়া বেদান্ত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অস্য—এই জগতের, জন্মাদি—জন্ম স্থিতি ও লয়, যতঃ—যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্ম। এখানে বেদান্ত, জন্ম স্থিতি লয় এই সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ যে জাগতিক ব্যাপার তাহারই উপরে, তাহারই সঙ্গে যুক্ত করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। যাহা ছিলনা তাহা হইল, ইহাই জন্ম। যাহা হইল তাহা থাকিয়া গেল, ইহাই স্থিতি। যাহা হইয়াছিল তাহা চলিয়া গেল, ইহাই মৃত্যু বা লয়। এই তিনটি ব্যাপার সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর যাহা ছিল না, তাহা কোথা হইতে আসিল? যাহা আসিল তাহাই বা কিসের জোরে রহিল? যাহা আসিয়াছিল তাহাই বা আবার কোথায় চলিয়া গেল? জগতের প্রত্যক্ষ জন্মাদি ব্যাপার দেখিয়া সকলেরই মনে এই প্রশ্ন আপনা হইতেই উদিত হয়। ইহার জন্য কোনও বিস্তৃত জ্ঞান, মার্জ্জিত বুদ্ধি, কিম্বা গভীর ধ্যানের আবশ্যক হয় না। অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেরই জন্মাদি ব্যাপার যেমন প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সেইরূপ সকলের মনেই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, হইয়া থাকে; না হইলেও বলা মাত্রই সকলের মনেই ইহা সহজে জাগিয়া উঠে। আর বেদান্ত বলিতেছেন যে এই যে প্রত্যক্ষ জন্মাদি-ব্যাপার, ইহার দ্বারা মনে স্বভাবতঃই যে জিজ্ঞাসার বা জানিবার ইচ্ছার উদয় হয়, সেই জানিবার ইচ্ছার নিবৃত্তি যাহা জানিলে হয়, তাহাই ব্রহ্ম। অর্থাৎ বেদান্ত জগৎ-কারণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কার্য্য দেখিলেই মন আপনার স্বভাববশে তাহার যথা-যথ কারণ অন্বেষণ করে। জগৎ-রূপ কার্য্য দেখিয়া মন ইহার অন্তরালে, আপনার স্বভাবে বা স্বতঃসিদ্ধ-প্রত্যয়বশে যে কারণের প্রতিষ্ঠা

করে, তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই জগতের লোকের একমাত্র উপাস্য। কারণ যে যাহারই উপাসনা করুক না কেন, তাহার আপনার উপাস্যকে সর্ব্বদাই জগৎ-কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

কেনোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব।

বেদান্ত আরও গভীরতর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু সে সকল তত্ত্বও প্রত্যক্ষেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর তারও বুনিয়াদ এই বহির্জগৎ ও এই মানুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই যে ব্রহ্মতত্ত্ব, যাহা হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়, তলবকার বা কেন উপনিষদে তাহাকেই মানুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বহির্জগৎ দেখিয়া যেমন আমরা তাহার কারণ ও প্রতিষ্ঠা কোথায়, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই; সেইরূপ এই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইহাদের কার্য্য ও প্রকৃতি যখন একটু তলাইয়া দেখি, তখন এগুলি যে স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহাদেরও প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়, তাহা খুঁজিতে আরম্ভ করি। চক্ষু রূপ দেখে, কর্ণ শব্দ শোনে, ত্বক স্পর্শ অনুভব করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে, রসনা রস আস্বাদন করে। এ সকল নিয়তই দেখি। কিন্তু কি করিয়া করে? ইহা ত বুঝি না। রূপ সম্মুখে থাকিলেই যে চক্ষু সকল সময় তাহা দেখে, তাহা ত নয়। সেইরূপ এই সকল করণের বা যন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের যোগ হইলেই যে শব্দ-স্পর্শাদির অনুভূতি হয়, এমনও ত নয়। এরা যন্ত্র; এদের পশ্চাতে কে যেন যন্ত্রী হইয়া আছেন। সেই যন্ত্রী যখন যে যন্ত্রকে চালিত করেন, তখনই সেই যন্ত্র আপনার কর্ম্ম করে। এইটিও ত প্রত্যক্ষ কথা। তবে জন্মাদি ব্যাপার যতটা সহজে প্রত্যক্ষ হয়, এসকল ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও কর্ম্ম ততটা সহজে ও অনায়াসে অনুভবগম্য হয় না। এই-জন্য একটু ধ্যান, একটু ভাবনা, সামান্য একটু অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা অনুভব করা সামান্য আয়াসসাধ্য মাত্র, দুঃসাধ্য

বা অসাধ্য নহে। আর এই ভাবনা মুখে করিয়াই তলবকার উপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে :—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।

কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃশ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥

রাজা ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছামাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন, অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণবায়ু তিনি আপনার ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দরূপ বাক্য নিঃসরণ হয়েন, যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্ দীপ্তিমান কর্ত্তা চক্ষুঃ ও কর্ণকে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ করেন। শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু উত্তর করিতেছেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং
সউ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য
ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হয় তিনি ব্রহ্ম হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির স্বতন্ত্র চৈতন্য আছে এমত জ্ঞান করিবে না। এইরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া আর. শ্রোত্রাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানীসকল এসংসার হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন।"

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মূলে, ইহাদের প্রেরয়িতা হইয়াও কিন্তু এই ব্রহ্ম এসকল ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আছেন। চক্ষে যাহা দেখা যায়, কাণে যাহা শোনা যায়, মন দিয়া যাহা মনন করিয়া জানিতে পারা যায়, তাহার কিছুই ব্রহ্ম নহেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-

রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ইহা নয়, ইহা নয়, "নেতি" "নেতি" বলিয়া ব্রহ্মের কথা ভাবিতে হয়। এই "নেতি"-"নেতি"র পথই ব্যতিরেকী পথ। এই পথে ব্রহ্মবস্তুকে বিশ্বাতীত, অজ্ঞেয় কিম্বা সত্তামাত্রজ্ঞের তত্ত্বরূপে সামান্যভাবে ধারণ করিতে পারা যায়। কেনোপনিষদে প্রথমে এই ব্যতিরেকী পন্থার উপরেই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। যাহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়রাজ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিলাভ যাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রথমে এই ব্যতিরেকী পন্থাই ধরিতে হয়। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। আর দেশের অবস্থা-বোধে রাজা এই জন্যই প্রথমে কেনোপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচার করেন। কেনোপনিষদ তৃতীয় খণ্ডে এক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম যে দেবতাদিগেরও অজ্ঞেয়, অথচ তাঁহার শক্তিতেই অগ্নি-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ শক্তিশালী হইয়াছিলেন, এই কথা প্রচার করিয়াছেন। এই ভাবে কেনোপনিষদ দেবতাদিগের ঈশ্বরত্ব বা ব্রহ্মত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। এই জন্যও রাজা এই উপনিষদখানি প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুণ্ডকোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব।

মুণ্ডকোপনিষদেও ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তবে কেনোপনিষদে ব্রহ্মের জগদাতীত ভাবটি যতটা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জগদ্ব্যাপ্তি ভাব ততটা ব্যক্ত করেন নাই। মুণ্ডকোপনিষদে এটি করিয়াছেন।

ব্রহ্ম চক্ষুশ্রোত্রাদির অগোচর, নিত্য, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয়। কিন্তু এই ব্রহ্মকেই পণ্ডিতেরা "ভূতযোনি"রূপে প্রত্যক্ষ করেন। এইভাবে মুণ্ডকোপনিষদ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বলিলেন—"মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তুসকল বাহির করিয়া জাল নির্ম্মাণ করে এবং পুনরায় এসকল তন্তুকে আপনার মধ্যে টানিয়া লয়, সেইরূপ এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় ও তাঁহাতেই বিলীন হয়।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

আর এই পুরুষই কর্ম্ম, তপ ও পরামৃত। তিনি সকলের বাহিরে ও সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন। এইরূপে জগৎকে ও জীবকে, বিষয়রাজ্যকে ও আপনার প্রাণমনাদিকে ব্রহ্মময় দেখিবে। তিনি ওতপ্রোতভাবে জীবে ও জড়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহাতে মনঃ-সমাধান করিবে। কেনোপনিষদ ব্যতিরেকী পন্থার উপরে ঝোঁক দিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদ অন্বয়ী পন্থার উপরেই ঝোঁক দিয়াছেন। আর উভয় পন্থাতেই আদিতে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

ঈশোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব।

ঈশোপনিষদেও এই অন্বয়ী-পথ ধরিতেই বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই জগতের যাবতীয় চঞ্চল বিষয়কে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ সকলের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া ঈশ্বর রহিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। ইহাতে জড়ের জড়ত্ব, জীবের জীবত্ব, সকলই ব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াতে এবং শিবের শিবত্বে পরিপূর্ণ ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

কঠোপনিষদের আত্মতত্ত্ব।

কঠোপনিষদেও এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে এই উপনিষদ আমাদের যে বস্তুকে আমরা "আমি" "আমি" বলি, এই অস্মদপ্রত্যয়বাচক অহংবস্তু বা আত্মবস্তুর উপরেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই অহংবস্তু বা আত্মবস্তু শরীরের

মধ্যে অশরীরী, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাস করিয়াও অতীন্দ্রিয়, মরজগতে থাকিয়াও অমর। ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। এই অজ, নিত্য, শাশ্বত, বস্তুই ত ব্রহ্ম। ওঁকার বা প্রণব এই বস্তুকেই নির্দ্দেশ করে। এই ব্রহ্মই জীবের আত্মা। আপনাদের আত্মাতে আত্মারূপে এই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে—ইহাই কঠ-শ্রুতির মুখ্য কথা। কঠোপনিষদ ব্রহ্মের অন্বয়ী উপাসনাও প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্ম প্রতিপদার্থের মধ্যে তত্তৎপদার্থরূপে ও তাহার বাহিরে এবং অতীতে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। বাহিরের ভূতগ্রামের মধ্যে ও নিজের আত্মাতে তাঁহার ধ্যান করিবে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রণব-তত্ত্ব।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই ব্রহ্মের সাধনতত্ত্ব বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণব বা ওঁ-কার এই সাধনের বীজমন্ত্র। এই উপনিষদ বিশেষভাবে এই প্রণবমন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ওঁ-কারের তিনটি পাদ বা অংশ। প্রথম পাদে ইহা বিশ্বরূপ। দ্বিতীয় পাদে এই ওঁ-কার প্রত্যেক জীবের মধ্যে বিষয়ীরূপে বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় পাদে এই ওঁ-কার সর্ব্বজ্ঞানের মূলাধার আনন্দময় ও আনন্দভুক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বিশ্বরূপ, বিষয়ীরূপ এবং বিশ্ব ও বিষয়ীর মিলন ও প্রতিষ্ঠাস্বরূপ প্রজ্ঞাঘন ও আনন্দঘনরূপ—এই তিন রূপেতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রণব বা ওঁ-কার শব্দ পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রণবসহায়ে এই তিন রূপেতে ব্রহ্মের মনন ও চিন্তনাদি করিতে হয়।

উপনিষদ-প্রচারে রাজার লক্ষ্য।

অতএব রাজা যে ক'খানি উপনিষদ প্রচার করিয়াছিলেন তার সকলেরই মূল সাধ্য ব্রহ্ম। কেনোপনিষদের ভূমিকায় রাজা কহিতেছেন—"এসকল শ্রুতি ব্রহ্মপর হয়েন কর্ম্মপর নহেন।" ঈশোপনিষদের ভূমিকায় কহিতেছেন—"এই সকল উপনিষদাদির দ্বারা ব্যক্ত হইবে যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্রব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং

বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়।...আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মনবুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে।" কঠোপনিষদের ভূমিকায় প্রার্থনা করিতেছেন—"হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগো আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমত অনুগ্রহ কর।" মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় বলিতেছেন :—

যে কোনো ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাঁহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে এই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এইমাত্র জানা যায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না। যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানে না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন। ...পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তারূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্তে সর্ব্বত্র কহেন...এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।...আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের

অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন।"

কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—রাজা যে পাঁচখানি উপনিষদ্ প্রচার করেন তাহাতে এই ইন্দ্রিয়াতীত, জগৎ-কারণ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। এই বহির্জগৎ ও আমাদের নিজ নিজ জীবনের ভিতরকার অভিজ্ঞতার চিন্তা ও ধ্যান করিয়াই, আমরা এই ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা ইহা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এখানে কোনও প্রকারের মিথ্যা কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। আর ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মকে সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই রাজা এই পঞ্চোপনিষদের প্রচার করেন। এইরূপেই তিনি কল্পিত দেবোপাসনা নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেবোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা।

কিন্তু পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে সকল দেবদেবীর বর্ণনা আছে, রাজা কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলে যে এঞ্জেল্‌দিগের কথা আছে, তাহাদের অস্তিত্বও রাজা অস্বীকার করেন নাই। আর কোন্ যুক্তিবলেই যে এসকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় না। আমরা এ সকল দেবদেবীর বা এঞ্জেলের সাক্ষাৎকার লাভ করি নাই, এই মাত্রই বলিতে পারি। কিন্তু যাহা দেখি নাই তাহাই যে নাই এমন কথা বলিতে পারি কি? আর মানুষের চাইতে শ্রেষ্টতর জীব যে জগতে নাই, এমন কল্পনাই বা করিব কিরূপে? তবে দেবদেবী বা এঞ্জেল্ আছেন বা থাকিতে পারেন, এই কথা মানিয়াও ইহারা যে জগতের কর্ত্তা নহেন, ইহারাও যে ব্রহ্মের বা জিহোভার পূজা করেন, ইহারাও যে মুক্তির প্রয়াসী, শাস্ত্রযুক্তিপ্রমাণে রাজা ইহাও দেখাইয়াছেন। আর এইভাবেই দেবদেবীর উপাসনার নিরসন করিয়াছেন। এই

সকল দেবদেবীকে যখন আমাদের কোনও প্রকারের প্রত্যক্ষ অনু-ভবের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারা যায় না ; "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—সূত্র কিম্বা "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং"—শ্রুতির ধ্যানে যখন ইহাদিগকে পরোক্ষ-ভাবে, তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের বা অন্তরিন্দ্রি-য়ের প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারা যায় না, তখন এসকল দেবদেবীর ধ্যানে ও চিন্তাতে কেবল মানস-কল্পনারই আশ্রয় লইতে হয়। প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে এরূপ উপাসনার কোনও জীবন্ত ও অপ-রোক্ষ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না। অথবা এইরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এসকল দেবদেবীকেই ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা আবশ্যক হয়। আর কোনও বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে, তার সম্বন্ধে কোনও সত্য-কল্পনাও করা যায় না। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এরূপই হইয়াছে। পুরাণতন্ত্রাদি এই সকল দেবদেবীতে ব্রহ্মের অধ্যাস করিয়া, দেবোপাসনার আশ্রয়ে ব্রহ্মোপাসনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপ অধ্যাস অর্থই—অন্যত্রদৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ—অর্থাৎ অন্যত্র যেবস্তু পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, এখন এখানে তাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া অনুমান বা অনুভব করা,—যাহাতে যে-বস্তু সহজে ও সত্যভাবে প্রত্যক্ষ নাই, তাহাতে সেই বস্তু আছে, এরূপ কল্পনা করা। এরূপ কল্পনা মানসক্রিয়া মাত্র ; ইহার সঙ্গে বস্তুসম্বন্ধ থাকে না। এরূপ কল্পিত উপাসনাতে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে উপাস্যের ও উপা-সকের উভয়েরই জীবন্ত সম্বন্ধের জ্ঞান ও উপলব্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়। মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বস্তু-আশ্রয়হীন হইয়া, প্রাণহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে মানুষকে তামসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। অন্যদিকে এই কল্পিত উপাসনাকে সজীব ও সরস করিবার জন্যই দেবদেবীর প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়। যাঁহারা নিজেদের অপরোক্ষ অনুভূতিতে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে আপনাদের অন্তরের ভাবাঙ্গ অবলম্বনে বাহিরে প্রতিমার

সাহায্যে ভাবমূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং এইরূপে যে প্রতীকোপাসনা হয়, তার একটা সার্থকতাও আছে। কিন্তু কেবল শ্রেষ্ঠতম সাধকেরাই এরূপ প্রতিমাপূজার অধিকারী। সাধারণের এ অধিকার নাই। এই পূজাতে অনধিকারী উপাসকের সহজ অতীন্দ্রিয়ানুভূতির স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। উপাসকেরা শব্দস্পর্শরূপরসাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এসকল দেবদেবীর উপাসনা ও প্রতিমার পূজা একদিকে যজমানকে একান্ত অন্তর্মুখীণ বা subjective, অথবা একান্ত বহির্মুখীণ বা objective জগতে বাঁধিয়া রাখে। এইরূপ দেবোপাসনাতে ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাড়া পাইয়া ও অতীন্দ্রিয়ের উপরেই ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মকে ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপন ও প্রত্যক্ষ করিয়া, দৃষ্ট ও অদৃষ্টের, সান্ত ও অনন্তের, সংসার ও পরমার্থের বিরোধ ও ব্যবধান নষ্ট করিয়া, জীবনকে পরিপূর্ণ সফলতার পথে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। আর জীবনকে সতেজ, কর্ম্মকে সার্থক এবং ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার, আর অন্যদিকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইখানেই রাজার জীবনের ও কর্ম্মের মূল সূত্রটি প্রাপ্ত হই। রাজা দেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই পথেই ধর্ম্মের শক্তি ও কর্ম্মের সফলতা লাভের সম্ভাবনা। এই কাজটি করিবার জন্যই রাজা এদেশে আবার বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের ও উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনার প্রচার করেন। এইজন্যই তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। এইজন্যই তিনি ব্রহ্মসভারও প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ কি এপথ ধরিয়া চলিয়াছেন? দেশের অপর

কোনও সম্প্রদায় বা মণ্ডলিই কি রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে-ছেন? রাজার কাজটি কি শেষ হইয়াছে? আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে? এসকল দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই ভাবিবার কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

খেলা

তুমি কত খেলা খেল নিত্য নব
আমার আঙিনা মাঝে।
আমি যে গো তার কিছুই বুঝিনে
থাকি সদা বাজে কাজে।
তুমি রোজ আস রোজ খেলে যাও
কি খেলা খেলিছ জানিতে না দাও
বিরলে বিজনে খেলা সাঙ্গ করি
কোথা যেন চলে যাও।
(আমি) পাছে পাছে ডাকি দাঁড়াও দাঁড়াও
তুমি না ফিরিয়া চাও।
একি খেলা তব ওহে লীলাময়
খেলাতে দিবে না ধরা?
তুমি চাও কিগো চির তরে মোরে
খেলার পুতুল করা?
তাই যদি চাও ভাল ভাল ভাল
সেদিকে চলিব যেদিকেতে চাল
যে খেলা খেলাবে সে খেলা খেলিব
তোমার বাসনা মত।
হার আর জিত সকলি তোমার
তুমিই খেলায় রত।

শ্রীহরনারায়ণ সেন।

হিন্দুদিগের ভূতত্ত্ব

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া মনে করিতেছি যে এই বিদ্যার কোন চর্চ্চা কোনদিন আমাদের দেশে হয় নাই, পাশ্চাত্যদিগের নিকট হইতেই আমরা ইহা প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমাদের এই সংস্কার যে কত ভিত্তিহীন ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হই।

সপ্তপাতালের নাম আমাদের সকলেরই নিকট সুবিদিত। এই সপ্তপাতালের বিবরণ পুরাণে পাঠ করিলে ইহারা যে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্তর তাহারই স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়—

"অতলং বিতলং চৈব নিতলং সুতলং তথা।
তলাতলং রসাতলং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥
কৃষ্ণা শুক্লারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনী।
ভূময়ো যত্র বিপ্রেন্দ্রা বরপ্রাসাদশোভিতাঃ॥"

"হে মুনিবরগণ! অতল, বিতল, নিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল নামে সপ্তপাতাল বিদ্যমান। এই সকল পাতালে কৃষ্ণা, শুক্লা, অরুণা, পীতা, শর্করা ও শৈলকাঞ্চনী ভূমি বিরাজিত।"

পূর্ব্বোক্ত পাতালস্তরের প্রত্যেকটিরই উচ্চতা দশ সহস্র যোজন—

"দশসহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তমাঃ॥" ২

ব্রহ্মপুরাণ ২১ অধ্যায়।

"দশযোজনসাহস্রমেকভৌমং রসাতলম্।
সাধুভিঃ পরিবিখ্যাতমেকৈকং বহু বিস্তরম্॥ ১১

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৪ অধ্যায়।

"প্রত্যেক রসাতলই দশ সহস্র যোজন এবং ইহাতে একমাত্র

তল বিদ্যমান। সাধুগণ এই অতিবিস্তৃত রসাতল সকলের বিষয় এই-রূপ বলিয়াছেন।"—(বঙ্গবাসীর অনুবাদ।)

"রসা" শব্দের অর্থ পৃথিবী *। সুতরাং 'রসাতল' যে পৃথিবীর স্তর তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

এক একটি পাতাল দশ সহস্র যোজন হইলে সমগ্র পাতালদেশ পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে কত নিম্নে অবস্থিত তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি এবং এরূপ নিম্নদেশের পরীক্ষা যে কিরূপ বহু কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল তাহাও আমরা বুঝিতে পারি।

উপরে আমরা নানাবিধ ভূস্তরের যে উল্লেখ করিয়াছি নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় তাহাদের বিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যায় যথা—

"কৃষ্ণভৌমঞ্চ প্রথমং ভূমিভাগঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
পাণ্ডুভৌমং দ্বিতীয়ন্তু তৃতীয়ং রক্তমৃত্তিকম্॥ ১৪
পীতভৌমঞ্চতুর্থন্তু পঞ্চমং শর্করাময়ং।
ষষ্ঠং শিলাময়ঞ্চৈব সৌবর্ণং সপ্তমং তলম্।"১৫

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৪ অধ্যায়।

"প্রথম রসাতল কৃষ্ণবর্ণ ভূভাগময়, দ্বিতীয় পাণ্ডুবর্ণ ভূমি, তৃতীয় রক্তভূমিবিশিষ্ট, চতুর্থ পাতাল পীতভূমিময়, পঞ্চম শর্করাময়, ষষ্ঠ শিলাময় ও সপ্তম সুবর্ণময়॥"

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্বে আমরা পৃথিবীর সর্ব্বনিম্নস্তরে শ্লেট পাথরের (Siberian) স্তর, তদূর্দ্ধে রক্তবালুকা প্রস্তরস্তর (Red Sand Stone), তদুপরি কয়লার (Coal) স্তর এবং ইহারও উপরে খড়ীমাটি (Chalk) স্তরের উল্লেখ পাই। পুরাণবর্ণিত স্তরসকলের কয়েকটির সহিত ইহাদের স্পষ্ট সাদৃশ্যই লক্ষিত হয়। শিলাময় স্তর ও শ্লেটপাথরের স্তর এক বলিয়াই মনে হয়, শর্করাময় ও রক্তবর্ণ ভূমি, রক্ত বালুকাপ্রস্তর স্তরেরই স্থানীয় বলিয়া বোধ হয় এবং

* ভূর্ভূমিরচলানন্তা রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা" ইত্যমরঃ।

পাণ্ডুবর্ণ ভূমি খড়ীমাটির স্তরের সহিতই অভিন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। শুক্ল বলিয়া এই স্তরের যে বর্ণনা প্রথমেই প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও এসম্বন্ধে নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ দিয়া থাকে। আমরা অগ্নিপুরাণের বর্ণনাতে যেন কয়লাস্তরেরও সন্ধান প্রাপ্ত হই; যথা—

"রুক্মভৌমং শিলাভৌমং পাতালং নীলমৃত্তিকং।
রক্তপীতশ্বেতকৃষ্ণভৌমানিচ ভবন্ত্যপি ॥"

শব্দকল্পদ্রুমধৃত অগ্নিপুরাণ ॥

এখানে "নীলমৃত্তিকা" আমাদের নিকট কয়লা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্বে যেমন মৃত্তিকাস্তরের পরীক্ষাদ্বারা পৃথিবীর গঠন ইতিহাসের উদ্ধার হইয়াছে, তেমনই মৃত্তিকাস্তরে জীবকঙ্কালের চিহ্ন বর্ত্তমান দেখিয়া পৃথিবীতে জীবসৃষ্টির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুরাণের ভূস্তর বর্ণনার সহিতও উক্তরূপ ইতিহাস আমরা সংগ্রথিত দেখিতে পাই। এখানে আমরা পুরাণের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রথমে তু তলে খ্যাতমসুরেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
নমুচেরিন্দ্রশত্রোর্হি মহানাদস্য চালয়ম্ ॥ ১৬

* * * * *

রাক্ষসস্য চ ভীমস্য শূলদন্তস্য চালয়ম্।
লোহিতাক্ষকলিঙ্গানাং নগরং শ্বাপদস্য তু ॥ ১৮
ধনঞ্জয়স্য চ পুরং মাহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
কালিয়স্য চ নাগস্য নাগরং কুলিকস্য চ ॥ ১৯
এবং পুরসহস্রাণি নাগ-দানব-রক্ষসাম্।
জলজ্ঞেয়ানি প্রথমে কৃষ্ণভৌমে ন সংশয়ঃ ॥ ২০
দ্বিতীয়েঽপি জলবিপ্রা দৈত্যেন্দ্রস্য সুরক্ষসঃ।
মহাজম্ভস্য চ তথা নগরং প্রত্যয়স্য তু ॥ ২১

হয়গ্রীবস্য কৃষ্ণস্য নিকুম্ভস্য চ মন্দিরম্।
শঙ্খাখ্যেয়স্য পুরং নগরং গোমুখস্যচ ॥ ২২

* * * * *

কম্বলস্য চ নাগস্য পুরমশ্বতরস্য চ।
কদ্রুপুত্রস্য চ পুরং তক্ষকস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
দ্বিতীয়েঽস্মিন্ জলবিপ্রাঃ পাণ্ডুভৌমে নসংশয়ঃ ॥ ২৫
তৃতীয়ে তু তলে খ্যাতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
অহ্লাদস্য চ পুরং পুরমগ্নিমুখস্যচ ॥ ২৬
তারকাখ্যস্য চ পুরং পুরস্ত্রিশিরসস্তথা।
শিশুমারস্য চ পুরং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলম্ ॥ ২৭
চ্যবনস্য চ বিজ্ঞেয়ং রাক্ষসস্য চ মন্দিরম্।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরং কুম্ভিলস্য খরস্য চ ॥ ২৮

* * * * *

এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্।
তৃতীয়েঽস্মিংস্তলে বিপ্রাঃ পীতভৌমে ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
চতুর্থে দৈত্যসিংহস্য কালনেমের্মহাত্মনঃ।
গজকর্ণস্য চ পুরং নগরং কুঞ্জরস্য চ ॥ ৩২
রাক্ষসেন্দ্রস্য পুরং সুমালের্বহুবিস্তরম্।
মুঞ্জস্য লোকনাথস্য বৃকবক্ত্রস্য চালয়ম্ ॥ ৩৩
বহুযোজনসাহস্রং বহুপক্ষিসমাকুলম্।
নগরং বৈনতেয়স্য চতুর্থেঽস্মিন্ রসাতলে ॥ ৩৪
পঞ্চমে শর্করাভৌমে বহুযোজনবিস্তৃতে।
বিরোচনস্য নগরং দৈত্যসিংহস্য ধীমতঃ ॥ ৩৫

* * * * *

কর্ম্মারস্য চ নাগস্য স্বস্তিকস্য জয়স্যচ।
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ ॥ ৩৭

পঞ্চমেঽপি তথাজ্ঞেয়ঃ শর্করানিলয়ৈঃ সদা।
ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ কেশরে র্নগরোত্তমম্‌॥ ৩৮
সুপর্ব্বণঃ সুলোম্নশ্চ নগরং মহিষস্য চ।
রাক্ষসেন্দ্রস্য চ পুরমুৎকোশস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৯
তত্রাসে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদা যুতঃ।
মহেন্দ্রস্য চ সখা শ্রীমান্‌ বাসুকির্নাম নাগরাট্‌॥ ৪০
এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্‌।
ষষ্ঠে তলেঽস্মিন্‌ বিখ্যাতে শিলাভৌমে রসাতলে॥ ৪১
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং পাতালে সর্ব্বপশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্‌॥ ৪২
অসুরাশীবিষৈঃ পূর্ণমুদ্বৃত্তৈ র্দেবশত্রুভিঃ।
মুচুকুন্দস্য দৈত্যস্য তত্র বৈ নগরং মহৎ॥ ৪৩
অনেকৈর্দিতিপুত্রাণাং সমুদীর্ণৈর্মহাপুরিঃ।
তথৈব নাগনগরৈঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ॥ ৪৪

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৪ অধ্যায়।

ইহা বিশেষরূপে লক্ষণীয় যে উদ্ধৃত বর্ণনায় আমরা মনুষ্যের কোন উল্লেখই পাই না; কেবল অসুর রাক্ষস দৈত্যদানবেরই উল্লেখ পাই। এই সকল আমাদের নিকট মনুষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী মনুষ্য ও পশু-ধর্ম্মা জীববিশেষ বলিয়াই বোধ হয়। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পাতালে, শঙ্খ, শিশুমার, শ্বাপদ, অশ্বতর, খর, কুঞ্জর, পক্ষী, মহিষ, নাগ প্রভৃতির যে উল্লেখ প্রাপ্ত হই তাহা পৃথিবীতে জীবসৃষ্টিরই পুরাতত্ত্ব প্রচার করে বলিয়া আমরা মনে করি। পৃথিবীতে প্রথম যে সমস্ত জীব উৎপন্ন হয় তাহাদের অতিপ্রকাণ্ডকায় সম্বন্ধে পাশ্চাত্যভূতত্ত্বেও বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রকাণ্ডকায় হইতেই আদি জীবসকল পুরাণে দৈত্যদানব প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীতে আমরা যে মহিষাসুরের সহিত চণ্ডীদেবীর যুদ্ধের বিবরণ প্রাপ্ত হই, সেই অসুর প্রকাণ্ডকায় আদি যুগের সৃষ্ট মহিষ নামক জন্তু

বলিয়াই মনে হয়। পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় হস্তীজাতীয় মেঘম্ নামক যে অতিকায় জীবের বর্ণনা করেন—পুরাণ-বর্ণিত গজ মহিষ প্রভৃতি তদ্রূপ অতিকায় জীব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

পাতালের পরেও পৃথিবীর যে বিস্তার আছে পুরাণে তাহার এই-রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা—

"পাতালান্তে চ বিপ্রেন্দ্রা বিস্তীর্ণে বহুযোজনে।
আস্তে রক্তারবিন্দাক্ষো মহাত্মা হ্যজরামরঃ ॥ ৪৬
ধৌতশঙ্খোদরবপুর্নীলবাসা মহাভুজঃ।
বিশালভোগো দ্যুতিমাংশ্চিত্রমাল্যধরো বলী ॥ ৪৭
রুক্মশৃঙ্গাবদাতেন দীপ্তাস্যেন বিরাজতা।
প্রভুমুখসহস্রেণ শোভতে বৈ স কুণ্ডলী ॥ ৪৮
সজিহ্বামালয়া দেবো লোলজ্বালানলার্চ্চিষা।
জ্বালমালাপরিক্ষিপ্তঃ কৈলাস ইব লক্ষ্যতে ॥ ৪৯
স তু নেত্রসহস্রেণ দ্বিগুণেন বিরাজতা।
বালসূর্য্যাভিতাম্রেণ শোভতে স্নিগ্ধমণ্ডলঃ ॥ ৫০

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৪ অধ্যায়।

"এই পাতালের বহুযোজনবিস্তীর্ণ নিম্নভাগে জরামরণহীন, রক্তপদ্মাক্ষ, ধৌতশঙ্খের ন্যায় উদর ও শরীরশালী, নীলবসন-পরি-হিত, মহাবাহু, মহাভোগী, বিচিত্রমালাধারী, স্বপ্রকাশ, বলবান্, মহাত্মা অনন্তদেব সুবর্ণ শৃঙ্গবৎ দীপ্তিশীল সহস্রবদনে শোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই অনন্তদেব চঞ্চলশিখাশালী অগ্নিসদৃশ জিহ্বামালায় পরিশোভিত হওয়ায়, জ্বালাকুলশোভিত কৈলাস-শৈলের ন্যায় মনোরম বলিয়া অনুভূত হয়েন। এই মনোহর মণ্ডলাকার শেষদেব বালসূর্য্যসদৃশ তাম্রবর্ণ মুখের দ্বিগুণ দ্বিসহস্র নেত্রে পরি-শোভিত ॥"

—(বঙ্গবাসীর অনুবাদ।)

উদ্ধৃত বর্ণনা পাঠ করিলে ইহা যে ভূগর্ভস্থ অগ্নিরই বর্ণনা এবং অনন্তদেব যে সেই অগ্নিরই নামান্তর, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই নাগই শেষস্তর বলিয়া ইহার নাম শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"সঙ্কর্ষ" নামক অগ্নি প্রলয়কালে ইহারই মুখ হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবী ব্যাপ্ত করে। সেই অগ্নির বর্ণনা পাঠ করিলে ইহা যে ভূগর্ভস্থ অগ্নি তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আমরা এখানে পুরাণ হইতে সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ ॥ ১৯
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্।
সবিভ্রচ্ছিখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্ ॥ ২০
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চ্চিতঃ ॥ ২১

ব্রহ্মপুরাণ ২১ অধ্যায়।

"কল্পাবসানে যদীয় বক্ত্রসমূহ হইতে বিষানলসমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণাখ্য রুদ্রদেব নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ গ্রাস করিয়া থাকেন, সেই অশেষ-সুরসমূহ-পূজিত শেষদেব শিখরীভূত অশেষ ভূমণ্ডল ধারণ করতঃ পাতালমূলে অবস্থান করিতেছেন॥" —(বঙ্গবাসীর অনুবাদ।)

হিন্দুগণ পৃথিবীর অবলম্বন সম্বন্ধে যে প্রথমে কূর্ম্ম, তদুপরি হস্তী, তদুপরি নাগ এবং নাগের ফণায় পৃথিবী এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহার মূলে ভূতত্ত্বেরই বিশেষ সত্য বিদ্যমান আছে বলিয়া আমরা মনে করি। পৃথিবী প্রথম যেরূপ ভাবে জীবকঙ্কালদ্বারা গঠিত হইয়াছে এখানে তাহারই ইতিহাস সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

কূর্ম্মজাতীয় জীবই প্রথম পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের কঙ্কালদ্বারাই পৃথিবীর প্রথম স্তর গঠিত হয়। তৎপর পৃথিবীতে গজ-জাতীয় জীবের আবির্ভাব হয় এবং তাহাদের কঙ্কালদ্বারা পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তর গঠিত হয়। তদনন্তর নাগজাতীয় জীবের আবির্ভাব হইয়া তাহাদের কঙ্কালদ্বারা পৃথিবীর তৃতীয় স্তর গঠিত হইয়াছে।

কূর্ম্ম গজ নাগাদি দ্বারা এইরূপে পৃথিবীর বহিরাবরণ গঠিত হওয়ায় ইহাদের দ্বারা পৃথিবীর ধারণ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। কূর্ম্ম যে দ্বিতীয় অবতাররূপে কল্পিত হইয়াছে, তাহাতেও কূর্ম্ম যে সৃষ্টির আদিযুগের জীব তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর "মেদিনী" নামের যে ব্যুৎপত্তি প্রচলিত আছে তাহাতেও আমরা পৃথিবীর স্তর-গঠনেরই ইতিহাস পাঠ করিতে পারি, যথা—

"মধুকৈটভয়োরাসীৎ মেদসৈব পরিপ্লুতা।
তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥"

"মধুকৈটভের মাংসদ্বারা ব্যাপ্ত হয় বলিয়াই পৃথিবী "মেদিনী" নামে আখ্যাতা হইয়াছে।"

মধুকৈটভ যদিও দৈত্যরূপেই পরিচিত, তথাপি ইহারা যে পৃথিবীতে প্রথমোৎপন্ন প্রকাণ্ডকায় অদ্ভুতাকৃতি জীববিশেষ, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবী প্রথমে জলময় বা দ্রবাবস্থা হইতে যে ঘনীভূতা হইয়া কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদিক সাহিত্যেও তাহার আভাস পাওয়া যায়, যথা—

"তদ্ যদপাংসর আসীৎ, তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ।" ইহার অর্থ এই যে, সেই অপরিসীম জলরাশি তেজ ও বায়ুদ্বারা পরিপক্ক হইলে তাহাতে সর অর্থাৎ এক প্রকার সারপদার্থ (দুগ্ধের সরের ন্যায়) উৎপন্ন হইয়াছিল। কিছুকাল পরে সেই সকল সর সংহত অর্থাৎ জমাট্ হইয়াছিল। তাহাই অর্থাৎ সেই জমাট্ ভাগই পৃথিবী॥*

তন্ত্রশাস্ত্রে আমরা পৃথিবী যে বহুস্তরের দ্বারা গঠিতা তাহার স্পষ্ট উল্লেখই প্রাপ্ত হই, যথা—

"ম্লেচ্ছকান্দা যথা ত্বগ্‌ভির্বহুভিঃ পরিবারিতঃ।
ষোড়ুতৈর্বহুভির্দেবি স্তরৈরেষা ব্যবস্থিতা॥"—(ব্রহ্মযামল)

* 'আর্য্যপ্রতিভা'—কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত।

"ম্লেচ্ছকন্দ (পলাণ্ডু বা লশুন) যেমন অনেকগুলি ত্বক্‌দ্বারা ক্রমশঃ পরিবেষ্টিত, সেইরূপ পৃথিবীও স্বীয় দেহোৎপন্ন বহুবিধ স্তর-দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।"*

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিরহ-মঙ্গল

পড়েনি গোলাপ-গণ্ডে একটি চুম্বন,
বাসনা রয়েছে তাই সদা সচেতন।
বাঁধুলী অধরে কভু মিলেনি অধর,
অধর রয়েছে তাই পিপাসা-কাতর।
বাঁধে নাই দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন-পাশে,
বাহু-বক্ষ আছে তাই চির উপবাসে।
হৃদয়-চাতক হ'য়ে পিপাসা-বিকল,
প্রতি পলে পলে মাগে একবিন্দু জল।
মিলন হইলে সব হ'তো পুরাতন,
বিরহ রেখেছে প্রেমে নিতুই নূতন।

পাহাড়িয়া পাখী।

---

*"আর্য্যপ্রতিভা"—কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত॥

কবি জয়নারায়ণ-প্রতিভা

লালা জয়নারায়ণ সেন, ইদানীং আর শিক্ষিত সমাজে অপরিচিত নন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একমাত্র পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে তাঁহার পরিচয় ছিল, পরে রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিরচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই কবিকে জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন। জয়নারায়ণ বিদিত হইলেন বটে, কিন্তু তদ্‌বিরচিত কাব্যনিচয় ও রচনাসম্ভারের পারিপাট্যের সহিত এ পর্য্যন্ত কাহারও সম্মিলন ঘটে নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৩০৮ সনের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকাতে "কবি লালা জয়নারায়ণ" এই নামধেয় একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক উহা লিখিত হইলেও তখন উহাতে কাব্যের ভাগ কিছুই সংযোজনা করা হইয়াছিল না। কেবল কবির বংশ পরিচয় ও গ্রন্থ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছিল। প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইতে চলিল (১) এই কবি কর্ত্তৃক "হরিলীলা ও চণ্ডিকামঙ্গল" নামে দুইখানি কাব্য-গ্রন্থ বিরচিত হয়; কিন্তু অদ্যাপি উহা প্রকাশিত হইয়া তৎ-গ্রথিত কবিতাকুসুমনিচয়ের সুগন্ধ আস্বাদন কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া—

---

(১) অত্রিপুত্র জয়নেত্র ষড়াননানন।
বসুমতী শাকে পুথি হৈল সমাপন॥
নারায়ণ প্রভুপদে করি দেহ মন।
ষোলশ্চ চৌরাশি শাকে পুস্তক লিখন॥
১৬৯৪ শকাব্দাতে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়।

উঠে নাই। এই কারণে আমরা ঐ কাব্যদ্বয় হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম। উহা পাঠ করিলেই সহৃদয় মহাজনগণ কাব্যগত গুণাগুণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। প্রথমতঃ হরিলীলা সম্বন্ধীয় কবিতাগুচ্ছ আলোচনা করা যাউক।

হরিলীলা, প্রচলিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী-গ্রন্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তবে উহা সাধারণ পাঁচালীর সীমা অতিক্রম করিয়া এক বৃহৎ কাব্যে পরিণত হইয়াছে। সত্যপীরের নাম বা তৎসম্বন্ধীয় কথা উহাতে স্থান পায় নাই, একমাত্র সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য লইয়াই উহার সংগঠন।

যেকালে পদ্মার একটানা স্রোতের মতন, আদি রসের খরবেগে বঙ্গীয় সাহিত্য-কানন প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে কয়েকজন কবির আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে জয়নারায়ণ ও তদগ্রজ সাধক কবি রামগতি রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রামগতি প্রণীত "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থ রচনার অল্প পরেই বোধ হয়, "হরিলীলা" এবং উহার অব্যবহিত পরেই "চণ্ডিকামঙ্গল" গ্রন্থের রচনা হইয়া থাকিবে। কারণ "চণ্ডিকামঙ্গল" গ্রন্থোক্ত "মাধব-সুলোচনা" প্রসঙ্গে পুরুষবেশধারী নায়িকা সুলোচনা উদভ্রান্ত নায়ক মাধবকে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া উপদেশচ্ছলে যে বাক্য * প্রয়োগ করিয়াছিল, উহাতে

---

* "বিধিমত কর যাইয়া একাদশী ব্রত।
নারায়ণে ডাকি শুন হরিলীলামৃত॥
নারায়ণ অগ্রজের নূতন বচন।
মন দিয়া তাহা যাইয়া করহ শ্রবণ॥
লিখিয়াছে পুথি ভব কলহ ভঞ্জিকা।
বোধ হেতু শুন মায়াতিমির চন্দ্রিকা॥

কবিদ্বয়ের গ্রন্থ কয়েকখানির পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে আরও অবগত হওয়া যায়, জয়নারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজনারায়ণ "পার্ব্বতী-পরিণয়" নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে সেই গ্রন্থখানির কোনরূপ অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"মায়াতিমির চন্দ্রিকা" আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, সুতরাং উহাতে ষড়রিপুদলন পক্ষে বহুযুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। "হরিলীলা" ও "চণ্ডিকা-মঙ্গল" ভক্তিযুক্ত কাব্য হইলেও নায়ক নায়িকা লইয়া উহার বিবৃতি, অতএব ইহাতে যে প্রথম রসের কতকটা ছায়া পতিত হইবে, তাহা ত নিশ্চিত কথা। কেই বা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখিতে যাইয়া, এই রসের হাত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন? আমাদের কবি জয়নারায়ণ একটানা লেখার স্রোতে সময় সময় বিপথগামী হইতেই আবার এইরূপ ভাবে উহা সামলাইয়া লইয়াছেন যে, সেই উদ্বুদ্ধ ভাবই তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইয়া রহিয়াছে।

হরিলীলা প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিনজন নায়ক ও তিনটি নায়িকা কল্পনা করা অন্যায় হয় না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সদানন্দ, ঐশ্বর্য্যশালী ধনপতি সওদাগর ও তদীয় জামাতা চন্দ্রভান নায়ক। ব্রাহ্মণী, সওদাগর-পত্নী ও তদীয় তনয়া সুনেত্রা হইলেন নায়িকা। কিন্তু প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক কলির মোচন হইতে। প্রথমে সেই অংশটিই গ্রহণ করা যাউক।

"ব্রাহ্মণের ক্ষেত ছিল, চষিতে অন্যেরে দিল,
দিয়া দ্বিজ ঘরে চলি যায়।
স্বর্ণোদরি ভূমি তায়, হাইলা স্বর্ণপাত্র পায়,
উচ্চরায় দ্বিজেরে ফিরায়॥

অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে।
পার্ব্বতীর পরিণয় নাম রাখিয়াছে॥
মহাভক্তি সারগ্রন্থ করেছে রচনা।
সে রহস্য শুনিলে ভুলিবে সুলোচনা॥"

ফির প্রভু ঘরা আসি, তোমাভাগ্যে পুত্ররাশি
ভাসি আমি আনন্দসাগরে।
ভূমেতে চষণ মাত্র, পাইয়াছি স্বর্ণপাত্র,
ক্ষেত্র হইতে নিয়ে যাও ঘরে॥
ব্রাহ্মণ নিকটে আইসা, পাত্র দেইখা হাসে হাইসা
বলে তখন কৃষাণের তরে।
আপন অর্জ্জিত ধন, পরে কর সমর্পণ,
নিতে ইহা উচিত তোমারে॥
হাইলা দিয়া কর্ণে হাত, ঘন স্মরে বিশ্বনাথ,
বলে পৈল বিচারের ভরা।
তোমার ভূমেতে পাইয়া, আমি ইহা নিয়া যাইয়া,
কেন হব নিজ ধর্ম্মহারা॥
ভূমি যার বিত্ত তার, ধর্ম্মমতে এই সার,
আর কথা শুনিছি শ্রবণে।
যজ্ঞভূমে চাষ দিয়া, সীতাতে সীতারে পাইয়া,
দিল নিয়া জনক রাজনে॥"

কিছুকাল এই প্রকার ন্যায়ের তর্ক শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির পরে কলির মন্দিরে যাইয়া উপনীত হইলেন। তথায় কলি ভেড়াভাবে আবদ্ধ ছিল; এখন যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া, সে বড়ই মিনতি করিতে আরম্ভ করিল; বলিল;—

"বাঁধা আছি বহুকাল, তবু নাহি হয় কাল,
তুমি কর মোচন আমার।"

ভেড়াটাকে মুক্তিপ্রদান জন্য যুধিষ্ঠির বলির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় বিমোহিত হইয়া বলি, মুক্তির আদেশ করিলে, ভেড়া তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হইল, অবিলম্বেই বলি প্রবুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, তুমি কাহাকে ভেড়া বলিলে, এই সাক্ষাৎ দৃষ্ট কলি। পরে শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বলিকে সম্ভাষণ করিয়া রথারোহণে

পুনঃ হস্তিনার পথে প্রস্থানকালে পুনরায় সেই ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র-সমীপে উপনীত হন। তখন দেখিলেন, ব্রাহ্মণের ও কৃষাণের পূর্ব্ব-কথা বিপরীত ভাবে চলিতেছে ;—

"দ্বিজ বলে আমি নিব, তোরে কেন ইহা দিব,
পাইছিস আমার ভূমেতে।
হাইলা বলে পাইয়া আমি, হইছি ধনের স্বামী,
তুমি কেটা হও ইহা নিতে ॥"

এই বিপরীত কাণ্ড অবলোকনে যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হরিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কলিকে মুক্ত করিয়াই ত যত অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছ। এখন,—

"পাতকে পূরিবে ক্ষিতি, লোকে হবে দুষ্টমতি,
কুরীতি হইবে চলাচল।
বিপ্র হবে বিদ্যাহীন, বেদ হবে অতি ক্ষীণ,
হীন হবে পৃথিবী যজ্ঞেতে।
বাড়িবে নারীতে ভক্তি, লইবে তাহার যুক্তি,
অবিশ্বাস জন্মিবে মায়েতে ॥"

* * * * *

কত দূরে দেখে আগাইয়া।
গৃহস্থে বিরোধ করি, জননীর কেশ ধরি,
স্ত্রীকে ধরে আবেশে মজিয়া ॥
নয়ন আরক্ত করি, জননীর কেশ ধরি,
অলক্ষ্মী বলি দূর করে।
বনিতা বিনতা মানি, পুরের লক্ষ্মী বাখানি,
ব্যস্ত হয়ে ত্রস্ত নেয় ঘরে ॥
দেখি বিপরীত কাণ্ড, স্ফুরিত লোচন গণ্ড,
পাণ্ডবপ্রধান চমকিয়া।

আপন কুরীতি কার্য্য, মনেতে করিয়া ধার্য্য,
ভূমে পড়ে অপার্য্য মানিয়া ॥
গোবিন্দ চরণে পড়ি, রাজা যায় গড়াগড়ি,
কেন হেন কৈলা ভগবান।
জগতে কুরব হৈল, আমার অখ্যাতি রৈল,
ইহা হৈতে মোরে কর ত্রাণ ॥
এ বলিয়া স্তব করে, নয়ান ভরিছে নীরে,
ধীরে ধীরে গদগদ রবে।
সুমতি (১)-সুতের বাক্য, শোন হে পুণ্ডরীকাক্ষ,
লক্ষ্য নাই তুমি পরে ভবে ॥"

অতঃপর যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও মানসপূজা। কি প্রকারে কলির জীব নিস্তার পাইবে, ইহাই রাজার ভাবনা। তখন শ্রীকৃষ্ণ, স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ;—

"কহে তখন ভগবান, শোন রাজা পুণ্যবান,
একরূপে কলি ধন্ত হবে।
এই লীলা সম্বরিয়া, সত্যনারায়ণ হইয়া,
আমি জীব নিস্তারিব ভবে ॥"

এই প্রকারে যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দান করিয়া নিজলীলা প্রকাশ মানসে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন।

"হেনকালে আইল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
জীর্ণতনু অন্নবিনে কৌপীন পরণ ॥
জরাজীর্ণ যষ্টি হাতে কাঁপে ঘন ঘন।
ঘন শ্বাস মন্দগতি কাঁপে অনুক্ষণ ॥

---

(১) সুমতি, কবির জননীর নাম।

দণ্ড ধলা ঝুলা দোলা চক্ষু গিছে তল।
হাঁটিতে কাঁপাইয়া পড়ে বলে জল জল॥
সঘনে বহিছে শ্বাস ঘন কাঁপে স্বর।
দুহাত কটিতে রাখা কথার নির্ভর॥
কক্ষে তুলা কতগুলা অস্থি চর্ম্ম সার।
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকে মোরে কর পার॥
ক্ষণেকে নয়ান মুদি তটে দাঁড়াইয়া।
স্তব করে সূক্ষ্ম রবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥

কি মর্ম্মভেদি দারিদ্র্য চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে!

স্তব সমাপ্ত হইলে পরে, নারায়ণ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই দীন ব্রাহ্মণ বলিল;—

"দ্বিজ বলে যারে বেটা মরিছি আপনে।
তাতে কেন জ্বালাইয়া ঘৃত দেও আগুনে॥"

যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই উপেক্ষিত, কোনকালেও কাহারও সহানুভূতি পায় নাই; যাহার নিকটে জগৎ একরূপ কষ্টের কারণ বলিয়াই অবধারিত হইয়াছে; জীবনের অন্তিম সময়ে যদি কেহ সেই উপেক্ষিতকে সদাশয়তা প্রদর্শন করিতে চায়, তখন সে কখনই অনুমান করিতে পারে না যে, তাহাকে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া স্নেহ কোন বাক্য ব্যয় করিতে উপস্থিত হইয়াছে! চিরদিন তাহার ভাগ্যে যে বিদ্রূপ লাভ হইয়াছে, অদ্যকার জিজ্ঞাসাও যেন তাহার নিকটে তদ্রূপই বিবেচিত হইল। এইজন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের এইরূপ উত্তেজিত ভাবে উত্তর প্রদান করা অস্বাভাবিক নয়। তবে শ্রীহরি যখন তাহাকে কোমলকণ্ঠে পুনরায় বলিলেন;—

"প্রভু বলে কেন বাছা ভাব বিপরীত।
তোমার দেখিয়া দশা বিগলিত চিত॥"

তখন ব্রাহ্মণ বুঝিল, বাস্তবিক এতদিন পরে যথার্থ দয়াময়ের সহিতই তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে ; তখন ;—

"শুনিয়া ব্রাহ্মণে দিল নিজ পরিচয়।
শোকধারা নয়নেতে অবিরত বয়॥
সদানন্দ নাম ব্রহ্ম কুলেতে উদ্ভব।
ভাগ্যহীন হেন তিন লোকেতে দুর্লভ॥
অতিশয় সুদীন করিল মোরে বিধি।
মুষ্টিভিক্ষা পাই যদি তবে মানি নিধি॥
নিত্য ঘরে একাদশী সহা নাহি যায়।
আপন উদর নাহি ভরয়ে ভিক্ষায়॥
তাতে আর ব্রাহ্মণী ত্রিলোকেতে লক্ষ্য।
দিনান্তে তাহারে নাহি দিতে পারি ভক্ষ্য॥
গিয়াছেন পিত্রালয় না পাইয়া ভিক্ষা।
আছে পাপ আয়ু তেই প্রাণ পায় রক্ষা॥
তাপে ঝাঁপ দিলে আমি নদী পায় শোষ।
বিনা দুষ্কর্ম্মেতে ভগবান্ মোরে রোষ॥
ভরিছে উদর মাত্র এই বয়সেতে।
শ্বশুর আলয়ে বিহা রাত্রির প্রভাতে॥
মুষিক আমার ভাঙ্গা ঘরে পড়ে মরি।
মার্জ্জার তাহারে না ধরিতে পারে নড়ি॥
লক্ষপতি কাছে গেলে মুখ বেকা তার।
জলনিধি মরুভূমি কটাক্ষে আমার॥
ব্রাহ্মণীর আয়ন্তের লক্ষণ মাত্র আমি।
কুলে বদ্ধি করিয়াছি, তেই ভাবে স্বামী॥
সদানন্দ নাম নিরানন্দে গেল কাল।
না সহে শরীরে পিতা উদর জঞ্জাল॥

ভাবিয়া উপায় কিছু না দেখি ভুবনে।
আসিয়াছি তাপনিবারণীর চরণে॥
আপন মনেতে আছে করিছি নির্ণয়।
গোবিন্দ উপরে প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয়॥
মাজ্জিয়া গঙ্গার নীরে জীবন ছাড়িব।
সহিতে বাড়ব জ্বালা আর না পারিব॥
আমি মৈলে মরিবেক ব্রাহ্মণী আপনে।
তবু ভাল কিবা লাভ রহিয়া জীবনে॥

কবি কি সুন্দর করুণা রসের অবতারণা করিয়া সদানন্দের দারিদ্র্য স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই করুণ কীর্ত্তন শুনিয়া বোধ হয়, পাষণ্ডের মনেও দয়ার সঞ্চার না হইয়া পারে না। চিরসুখী জনের মনে এইরূপ দারিদ্র্য-চিত্র কতকটা অস্বাভাবিক বোধ হইতে পারে। কিন্তু যে মানব একদিবসের তরেও পরিজনসহ অনশনে কাটাইয়াছে, সেই ভুক্তভোগীই বুঝিয়াছে, এইরূপ ভাবে দিন কর্ত্তন করা কতটা মর্ম্মান্তিক!

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভগবানের স্তবে, কবি একস্থানে বলিয়াছেন;—

"তুমি যারে সানুকূল, সেই ভবে পায় কূল,
রিপু তার অনুকূল হয়।
আপনি যাহারে রোষ, কর নাথ পাইয়া দোষ,
জগভরি তারে তোষ নয়॥"

নারায়ণের কৃপাকণিকা প্রাপ্ত হইয়া, অত্র হইতে সদানন্দ মনুষ্য-মধ্যে গণনীয় হইতে চলিয়াছে। নারায়ণ তাহাকে দুঃখ বিমোচনের উপায়স্বরূপ নিজ ব্রত-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। আর এই ব্রত উদ্‌যাপন করিলে সে অচিরেই সমুদয় কষ্ট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সৌভাগ্যের সোপানে অধিরোহণ করিতে পারিবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

এইদিবস সদানন্দ দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়া, ভিক্ষায় বাহির হইলেন। আজ যেন আর তাঁহার অন্তঃকরণে কোনপ্রকার অবসাদের চিহ্ন নাই, এক স্বর্গীয় অলৌকিক তেজ তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাকে যেন পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে;—

"ভাবিয়া গোবিন্দ পায়, ভিক্ষালাগি দ্বিজ যায়,
পাদও নাহি পরশে ভূমিতে।
যে পথে যখন গেল, শতগুণ ভিক্ষা পেল,
বস্ত্র নাহি রাখিবে কিসেতে॥
দরিদ্র ক্ষুদ্রপ্রত্যাশী, পাইয়া তণ্ডুলরাশি,
লাগিলেক স্বপন ভাবিতে।
তণ্ডুল আড়াই সের, অনুমানে পাইয়া ঢের,
এ আনন্দ নারে পাসরিতে॥
ক্ষণেকে হাটিয়া যায়, ক্ষণেকে খুলিয়া চায়,
ক্ষণে নেয় দোকানে মাপিতে।
এরূপ ভিক্ষায় পায়, আপন বাড়ীতে যায়,
ব্রাহ্মণীকে ডাকিতে ডাকিতে॥"

ডাকহাঁকে ব্রাহ্মণী পতিসমক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঠাকুর আজ কোঁচড় ভরিয়া চাউল নিয়া উপনীত হইয়াছেন। উহা দর্শনে তাহারও বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না!

"নিরখি তণ্ডুলচয়, ব্রাহ্মণী হাসিয়া কয়,
প্রভু আজি যাত্রা সুপ্রভাত।
ভাগ্যের উদয় এত, ভিক্ষা উদরের মত,
ঘটাইলা কোন্ সাহসেতে॥"

তখন,—

দ্বিজ বলে ভাগ্যবতী, আমি যে তোমার পতি
এতদিন নারিছ বুঝিতে।

ছিল মোর গ্রহদুষ্ট, তেকারণে এত কষ্ট,
পাইয়াছ আমার যোগেতে ॥
এবে গেল দুরদৃষ্ট, আগত দিবস শ্রেষ্ঠ,
দেখ কিবা করি ক্ষমা তাতে।
তুমিও হইয়া স্থিরা, পূর্ব্ব রীত কর ফিরা,
সুনয়নে চাহিও আমাতে ॥
হতভাগ্য না বলিও, মুখবেকা না করিও,
না গঞ্জিও শয্যায় আসিতে।
আজি যে দুখের রাতি, পোহাইল পুণ্যবতী,
আর দুঃখ না হবে নিশ্চিতে ॥"

অতঃপর বনিতার সমীপে সত্যনারায়ণের উপদেশমত তাঁহার ব্রত রক্ষার কথা সমুদয় বর্ণন করিয়া, পূজার জন্য অর্দ্ধ তণ্ডুল উঠাইয়া রাখিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, মানসিক পূজাসম্পাদনের পর হইতেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিণত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সম্পদ ও দাসদাসীর পরিসীমা রহিল না; তাহাদের স্বভাবেরও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। কবির এইস্থানের বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করা হইল;—

"এইমত নিত্য দ্বিজ পূজে নারায়ণ।
অপার ঐশ্বর্য্য হইল, রাজ্য ধন জন ॥
দাসদাসী ধন ধান্য পুত্র ধরা ধর্ম্ম।
দরিদ্র দ্বিজের হইলেক আর জন্ম ॥
যে পদ ভুবন ভ্রমি পড়েছিল রেখা।
কত স্বর্ণ পাদুকা না পায় তার দেখা ॥
যে উদর জন্মে ভরেছিল একবার।
ঈষদুষ্ণ পায়সেতে অরুচি তাহার ॥

যে কটিতে কৌপীনেতে না রহিছে ধান্ত।
সে কটিতে গরদ বসন নহে গণ্য॥
যে নারী মধুর বাক্য না কহিছে জন্মে।
সে নারী সেবয়ে পদ লাগাইয়া মর্ম্মে॥
তৃণের শয্যায় সুখী ছিল যে নারীর।
কুসুম শয্যাতে সে রমণী নহে স্থির॥
যে নেত্রেতে সদা ছিল সলিলের ধার।
সে নেত্রে অঞ্জন শল্য কণ্টক প্রহার॥
লাবু বীজ ছিল যে দশন পাণ হীনে।
সে মুখে না যায় পাণ কর্পূর বিহনে॥
ভগ্ন কানি যে বক্ষের ছিল আচ্ছাদক।
সে বক্ষে মণির হার ক্ষণেকে রোচক॥
নারায়ণ বচনে ভুবনে কিবা নয়।
তৃণে করে পর্ব্বত, পর্ব্বত তৃণ হয়॥"

সদানন্দ ও তাহার স্ত্রীও যে এই পরিবর্ত্তনের বশবর্ত্তী হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। তবে অনেকেই অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভগবানকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়, কিন্তু সদানন্দের পরিবারে তাহা কখনও আর ঘটে নাই। এইজন্যই তাহার পরিবর্ত্তিত ভাগ্যের আর বিপর্য্যয় ঘটে নাই। অতঃপর সওদাগরের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ভগবানের কথা বিস্মৃত হওয়ায় তাহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল।

সত্যনারায়ণের সেবাদ্বারা ব্রাহ্মণের উন্নতি দর্শনে এক দরিদ্র কাঠুরিয়া ভক্তিভাবে সত্যদেবের প্রসাদ লইয়া, উন্নত হইতে পারিলে, বিধিমতে সত্যসেবা করিবে বলিয়া মানস করিল। অচিরে তদীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে, কাঠুরিয়া নিয়মমত সত্যদেবের আরাধনায় নিরত থাকিল।

একদা কোন সওদাগর বাণিজ্য হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন সময়ে জলযান হইতে তীরে উঠিয়া দেখিল, কতকগুলি লোক, আটা, কলা, দুগ্ধ, চিনি ও নারিকেল প্রভৃতি উপহার সম্ভারে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইল, সত্যদেবের পূজা হইতেছে, এই সেবার ফলে দরিদ্র, ধনী হয় এবং অপুত্রক, পুত্রলাভ করিতে সমর্থ হয়। সওদাগর, তৎশ্রবণে ভক্তিসহকারে দেবতার বন্দন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মানস করিল, পুত্র অথবা কন্যা এই উভয় মধ্যে যাহাই হউক, সে লাভ করিতে পারিলে, যথোচিত ভাবে সত্য-দেবের অর্চ্চনা করিবে। অতঃপর তদীয় বাণিজ্যতরীসহ সওদাগর স্বদেশে প্রস্থান করিল।

"গৌড়রাজ্য ধাম, ধনপতি নাম,
তাহে আসি উত্তরিল।
লাগে নৌকা ঘাটে, লোক উঠে তটে,
মহা কোলাহল হৈল॥

* * * * * *

শুনিয়া এ ধ্বনি, সাধুর রমণী,
অমনি উঠিল ধাইয়া।

* * * * * *

না সম্বরে বাস, মুখে কত হাস,
দিবা নিশি নাহি চিনে।
বিগলিত কেশে, আলুলিত বেশে,
ঘৃতদীপ জ্বালে দিনে॥"

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সওদাগরের কথা বলিয়াছি, তিনিই এই ধনপতি সওদাগর। বাণিজ্যব্যপদেশে বহুদিন বিদেশে অবস্থান করিয়া, এইমাত্র বাড়ীতে উপনীত হইয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া

সাধুর বনিতা এত হর্ষযুত হইয়াছেন, যে উহাতে তাঁহাকে আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছে। এখন দিবস কি রাত্রি এই জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার নাই, তিনি রাত্রিভ্রমে দিবসেই ঘৃতদীপ জ্বালাইয়াছেন। অচিরে দম্পতির মিলন হইল। এইকালে কবি, একেবারে দম্পতির মিলনের বর্ণনা করিতেই পুনরায় আত্মসংযমে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাই জয়নারায়ণের বিশেষ কৃতিত্ব। পরে কবি বলিতেছেন ;—

"ধৈরয সখাতে শিখাইয়া নীতে
উঠাইলা কর ধরি।
কি দিব উপমা, ধৈরয মহিমা,
অঙ্কুশে ফিরিলা করী ॥"

অতঃপর দেবানুগ্রহে সওদাগরের একটি কন্যাসন্ততি জন্মলাভ করিল। পরে যৌবন সমাগত হইতেই, মামুলী প্রথামত কবিকর্ত্তৃক উহার একটি বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। তবে পাঠকগণ ইহার মধ্যে নূতন উপমা কতকটা দেখিতে পাইবেন। এইজন্য উহা এই স্থানে সন্নিবেশ করিলাম।

রূপ বর্ণনা।

"কুটিল কুন্তল বাঁধ বন্ধন শঙ্কায়।
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায় ॥
নীল সরোরুহ আর মিলি নীলোৎপল।
নয়ন দেখিয়া তারা প্রবেশিছে জল ॥
আছিল মদন মদ লইয়া ধনুর্ব্বাণ।
একটাক্ষে ভব ভালে হরে গিছে মান ॥
অঙ্গ লভি অনঙ্গ দেখিত যদি জ্যোতি।
অবশ্য করিত তবে রতির বিরতি ॥
রতিপতি বিরহেতে কাতি দিত গলে।
ভাল দগ্ধ হৈল কাম হর-কোপানলে ॥

স্থির দীপশিখা যেন তেন নাসা সাজে।
ওষ্ঠাধর পক্ব বিম্বফল সম রাজে॥
দন্তাবলি কুন্দকলি করিছে প্রকাশ।
ঈষৎ প্রফুল্ল পদ্ম জিনি সুধাহাস॥
হাসে না সে যোগীর তপস্যা নাশ করে।
হাস্যচ্ছলে অধরে কি অনঙ্গ বিহরে॥
মরিয়াও সাধু হিংসা খল নাহি ত্যজে।
খল খল পালাতে ভুবনমোহে লাজে॥
লাবণ্যের চিহ্ন প্রতি অঙ্গেতে ব্যাপক।
উরসে উদিত যুগ কদম্ব-কোরক॥
শয়ম্ভূ উদিত দেখি ভ্রমে রতি ওরে।
পতি পোড়া ভাবে, পূজা করিয়াছে শিরে॥
তেকারণে কুচ পরে যৌন কাল চিহ্ন।
বৃথা অভিমানে হয় দাড়িম্ব বিদীর্ণ॥
বাহুযুগ শোভে যেন মৃণাল বলনী।
কহিবার কথা তাথে কোথায় লাবণী॥
যে বাহুপাশের বান্ধ হর রিপু চায়।
আলিঙ্গনে অনঙ্গ পুন বা অঙ্গ পায়॥
নবীন পল্লব ছিল করের উপমা।
কাপে শুনি বায়ুমুখে হস্তের মহিমা॥
অঙ্গুলি চম্পক ফণি নখর নিকর।
নিরাপদ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক সুন্দর॥
মহেশ ডম্বুর কটি ত্রিবলীর পাশে।
বাঁধিয়াছে বিধি দুর্গ পথগতি ত্রাসে॥
নাভি-কূপে ছিলরে নবীনা ভুজঙ্গিনী।
ঊর্দ্ধে উঠেছিল হতে পবন ভোজিনী॥
খগপতি-চঞ্চুসম দেখি তার নাসা।
কনক গিরির মাঝে করিলেক বাসা॥

নিতম্ব করীন্দ্রকুম্ভ কুকদলী উরু।
উপমা কি দিব তার মদনেতে গুরু॥
কোকনদ সম্পদ সেবিত পদতল।
চরণে রাজিছে যেন কোমল কমল॥
সুনখর কিরণে চন্দ্রের কর নিন্দে।
তুমি ক্ষীণ নিতি আসি পূর্ণ মহানন্দে॥
অসম্ভব রূপ দেখি লোক চমকিত।
বলে শাপভ্রষ্টে কি অপ্সরা উপস্থিত॥

অতঃপর—

ইতিমধ্যে যোজনা করিয়া ভাট আসে।
কহে সওদাগর শুদ্ধ ভাট নিজ ভাষে॥

এইস্থানে মিশ্র হিন্দীতে ভাটকর্ত্তৃক পাত্রপক্ষের ঐশ্বর্য্য ও বরের রূপ-গুণ-বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

অদ্য সুনেত্রার বিবাহ। রত্নপতি সওদাগর, পুত্র চন্দ্রভান সমভি-ব্যাহারে ধনপতি সওদাগরের ভবনে উপস্থিত। উভয় সওদাগর মহা-ধনসম্পন্ন, অতএব ঘটাসমৃদ্ধির পরিসীমা নাই। এদিকে লগ্ন উপস্থিত:—

"কুমারীকে আইও সবে সাজাইয়া ঘরে।
হরীতকী বান্ধি দিল উত্তরী অম্বরে॥
নতশিরে জননীকে প্রণাম করিছে।
* চন্দ্রমুখ ধরি ধনী চুম্বিয়া বলিছে॥
যার লাগি ছিলে বাছা দেই গো তাহারে।
জনম গোয়াইও সুখে শঙ্খ সিন্দুরে॥
নিজ পতির সুদৃষ্টিতে কাটাইও কাল।
সুখালম শ্বশুর শাশুড়ী কথা ভাল॥

ননদী-যা-গণে যেন প্রাণতুল্য দেখে।
শ্বশুর দেবর নাহি কুনয়নে লেখে॥
হে ধর্ম্ম তোমারে আমি সাক্ষী করে কই।
সুনেত্রার ইহা হয় যদি সতী হই॥"

বিবাহ হইয়া গিয়াছে, নানারূপ আমোদপ্রমোদে দিন অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু যে সত্যদেবের কৃপায়, সাধুর কন্যারত্ন লাভ হইয়াছে, এখন আর সেই নারায়ণকে তাহার স্মরণ নাই।

"ভুলিয়া মানস নারায়ণের মনেতে।
নানামত সুখে ভাসে কন্যা-বিবাহেতে॥
যাহারে ভাড়ায় হরি কে রাখিতে পারে।
প্রথমেতে রাখে তারে সুখ-পারাবারে॥
সুখে ভুলি যে না ভোলে হরির চরণ।
সেই হয় ভক্ত পাছে আছে নারায়ণ॥"

* * * *
* * * *

হেন হরি হেলাতে হারায় ধনপতি।
কহা নাহি যায় কিছু বিদশার গতি॥"

এদিকে ধনপতির ধনরত্ন ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া উঠিল, আর বাণিজ্যে গমন না করিলে হয় না, এইজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

"বাণিজ্যে হইল হীন চিন্তে সওদাগর।
ফুরাইল পূর্ব্বলাভ সদা মনে ডর॥
মূলধনে পৈল হাত কি হবে উপায়।
উদ্যোগী না হলে লক্ষ্মী ভজয়ে কোথায়॥
করিল মন্ত্রণা পুনঃ বাণিজ্যে যাইতে।
বিদ্যা শিখাইতে সঙ্গে জামাতাকে নিতে॥"

সাধু নিজ সঙ্কল্পিত মনোভাব স্বীয় গৃহিণীকে জানাইলেন, সুনেত্রারও অজ্ঞাত রহিল না, কিন্তু তাহারা মাতা ও কন্যা এই কথায় বড় সন্তুষ্ট হইল না। যাইবার পূর্ব্বরাত্রিতে চন্দ্রভান ও সুনেত্রার মধ্যে এতৎসম্বন্ধে বিস্তর কথা হইল।

সুনেত্রা—

"ভোরে নাথ যাবে ছাড়ি, বিরহ অনলে পুড়ি,
কারে কব, আজি যেন রজনী পোহায় না॥"

চন্দ্রভান—

"সুনেত্রাকে সম্বোধিয়া বলে চন্দ্রভান।
বাণিজ্যে বিদেশে যাওয়া হইলে বেহান॥
নিশ্চয় হয়েছে ইথে এড়ান না যাবে।
হাসি ভাল মনে মোরে বিদায় করিবে॥
কতকালে আসি জানি দেখা কবে হয়।
মোর মনে লয় মোর প্রাণ মোর নয়॥
তোমার মনের কথা জানে ভগবান্।
হৃষ্টমনে কহ যাই দিয়া খিলিপান॥"

তৎপর—

"ঘোরতর যামিনী অতীতা এই মতে।
পূর্ব্বদিক রক্ত দিনকর-কিরণেতে॥
সুনেত্রার মুখ হেন হইয়া অরুণ।
ঈষৎ প্রকাশে যাহে রমণী করুণ॥
আকাশে নক্ষত্রগণ ভাঙ্গি যায় মেলা।
চক্রবাকী প্রবৃত্ত পতির প্রেম-খেলা॥
পাখীগণ উড়ি উড়ি নিজ বাসা ছাড়ে।
বিরলে ডাকিছে কাক ভূমে নাহি পড়ে॥
চন্দ্রভান করযুগ ধরি সুনেত্রার।
যাই বলি বিদায় মাগিছে বার বার॥

মনে মনে ভাবে বামা কি দিবে উত্তর।
বচনে জীবনে বাদ আছিল বিস্তর॥
অধোমুখে বালা কুচকদম্ব নেহারে।
ধীরে ধীরে কহে তিতি নয়নের নীরে॥
যাবা যদি যাই যাই না বলিও আর।
বজ্রের গর্জ্জণে ভয় পতনে নিস্তার॥
চন্দ্রভান বলে কিবা আনিব সন্দেশ।
বালা বলে জলাঞ্জলি তীর্থেতে বিশেষ॥
কেমন সাহসে মুখে বলিব যাইতে।
নহি সে যোগ্যের যেবা কহিব রহিতে॥
লাভে চলিয়াছ শুভ করুন গোসাঞি।
তোমা হেন পতি যেন জন্মে জন্মে পাই॥
বিস্তর বচনে অতি ব্যথা পাছে হয়।
পতির মঙ্গলে নারীর যা কেন না হয়॥
কিন্তু এই নিবেদন থাকে যেন মনে।
না ভুলিও নানা দেশ বিদেশ গমনে॥
এ বলিয়া প্রণাম করিল অধোমুখী।
মুকত চিকুরে তার ছল ছল আঁখি॥
উষাকালে যাত্রা করি যায় চন্দ্রভান।
সজল নয়নে ধনী পাছেতে পয়ান॥
যতদূর আঁখি চলে চাহে দাঁড়াইয়া।
সুধাকর যায় ইন্দীবর ভাড়াইয়া॥
নিশিভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল।
রবি আলোকনে মুখ মলিন হইল॥"

পাঠক মহোদয়গণ, এই কবিতাগুচ্ছের গুণাগুণ যাহা হয়, সমালোচনা করুন। আমাদের মনে হয়, এই গ্রন্থখানি এইরূপ আরও প্রচুর সুগন্ধি কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

জামাতৃসহ ধনপতি সিংহলে উপনীত হইয়া বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তাঁহার যথেষ্ট লভ্য হইতে লাগিল, কিন্তু সত্যনারায়ণকে একবারও মনে পড়িল না। এদিকে রাজগৃহে চোর উপস্থিত হইয়া, রাণীর গলার হার ও রাজার তলোয়ার লইয়া প্রস্থান করে। চোর সেই উভয় দ্রব্য ধনপতি সওদাগরের নিকটে বিক্রয় করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি উহা অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া লয়েন।

ইতিমধ্যে রাজবাড়ীতে চুরির বিষয় লইয়া বিষম তোলপাড় আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমেই কোতোয়াল বেচারার উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল। রাজার নিকটে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া কোতোয়াল সহচরগণসহ চোর ধরিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। বহু চেষ্টার পরে ধনপতি সওদাগরের নিকটে তলোয়ার ও হার পাইয়া তাহাকে ধৃত করিল। রাজার আজ্ঞায় কোটালের যে দশা ঘটিয়াছিল, ততোধিক দুর্দ্দশা সওদাগরের ভাগ্যে ঘটিল। তৎপরে তাহাকে ও তদীয় সঙ্গীসকলকে বন্দী করিয়া, রাজার সন্নিকটে হাজির করিল। এই স্থানে কতকগুলি শব্দ-সম্পদের সহিত কবিকর্ত্তৃক সভা-বর্ণনা সম্পাদিত হইয়াছে।

"সভামধ্যে রত্নসিংহাসনে নরপতি।
শিরে শ্বেত ছত্র সে অরুণ জিনি ভাতি॥
দক্‌ দক্‌ জ্বলে মণি ত্রিপুণ্ড্রক ভালে।
মিস্‌ মিস্‌ শুক্তি মুক্তা ভ্রূমধ্যে জ্বলে॥

* * * * *

টল্‌ টল্‌ মুকুতাকুণ্ডল কাণে দোলে।
ঢলু ঢলু গজমতি দোলে গলে॥

* * * * *

ডগ্‌ মগ্‌ সপ্তকন্যা চামর লইয়া।
ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া॥

ঝন্ ঝন্ লাগে কাণে কঙ্কণের ধ্বনি।
চক্ মক্ চামর-দণ্ডেতে জ্বলে চুণী॥
গল গল ভাটে যশ পড়িছে ডাকিয়া।
জয় জয় স্তুতি করে বন্দী বিরচিয়া॥
টলমল বসুন্ধরা কাঁপিছে প্রতাপে।
থর থর অমাত্য সঘনে হেরি কাঁপে॥
মিটি মিটি নয়নেতে চাহে যার পানে।
ধক্ ধক্ বুক বাক্য না সরে বদনে॥"

রাজার আদেশে স্বগণসহ সওদাগর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তখন "বিপত্তৌ মধুসূদনং," নাম তাহার স্মরণ হইল। সত্যনারায়ণের মানস সম্পন্ন না করাতেই যে তাহার এই বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন সেই সত্যদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে রত হইলেন। এইস্থানে পঞ্চাশৎ বর্ণের স্তুতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এদিকে সওদাগরের গৃহের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বহুকাল পর্য্যন্ত সওদাগরের সহিত সাক্ষাৎ নাই, সঞ্চিত ধন যাহা ছিল, তদ্দারা কোন প্রকারে কতক কাল কাটিয়াছে, পরে দৈন্যের তাড়নায় ধনপতির স্ত্রী ও কন্যা অন্নাভাবে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা অগতির গতি সত্যনারায়ণকে স্মরণ করিয়া যথাসাধ্য অর্চ্চনা করিতে ত্রুটি করিতেছে না। এতদিনে দয়াময়ের দয়া হইল, নিশিথে স্বপ্নযোগে সিংহলনাথকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া, সাধুর সাধুত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক তাহাকে মুক্তি প্রদানের আদেশ করিলেন। ধনপতি রাজার সমীপে আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলে, রাজা বলিলেন;—

"না কহিও আর কিছু সাধু সাধুসুত।
বুঝিছি সকলি মিছে বিনা বাতে ভূত॥

অপূর্ব্ব সংবাদ এবে পড়িলেক মনে।
শুনিয়াছি পিতা মহারাজের কথনে॥
আর এক ধনপতি গৌড়রাজ্য হতে।
আসিছিল বাণিজ্যেতে সিংহল দিকেতে॥
পথেতে আসিতে অতি হেরিল আশ্চর্য্য।
সমুদ্রেতে পদ্মবন গন্ধে মোহে রাজ্য॥
তাহে এক পদ্মদহে বসিয়া কামিনী।
করী ধরে গিলে পুনঃ উগারে আপনি॥
গজ গিলে পদ্মিনী বসিয়া পদ্মদলে।
অভেদ অরুণ পদ্ম দশ পদতলে॥
নয়ন ভঙ্গিতে খেলে খঞ্জরীট খেলা।
একাকিনী করিয়াছে জলধি উজলা॥

সাধু এই চমৎকার দেখিল নয়নে।
আসি মাত্র এই বৃত্ত কহিল রাজনে॥
অসম্ভব শুনি রাজা প্রত্যয় না করি।
প্রতিজ্ঞা করিল দেখাইবেক সুন্দরী॥
নৌকা-আরোহণেতে রাজাকে তথা নিয়া।
না পারিল দেখাইতে মহামায়া মায়া॥
সাধুর দুর্দ্দশা দিন আগমন জানি।

*　　*　　*　　*

কোথা নাই পদ্মবন সমুদ্রে চাহিয়া।
গিয়াছে সে বিশ্বনাথ-মোহিনী মোহিয়া॥
ধনপতি দ্বাদশ বৎসর কারাগারে।
আছিল এদেশে সেই রাজ-অঙ্গীকারে॥
পরে তার পুত্র মহাশাক্ত ভক্তমতি।
পিতার উদ্দেশ্যে আসি ভেটিল নৃপতি॥

পণ করি সেই স্থানে রাজাকে লইয়া।
জগন্মাতা ত্রিলোকতারিণী দেখাইয়া।
মুক্ত করি পিতা লইয়া নিজদেশে গেল।
এই দৈব চমৎকার তেমতি হইল॥

পাত্র সব বলে মহারাজ দড় এই।
দুষ্ট নহে এই সাধু অনুভব সেই॥
সাধু বলে পূর্ব্বে যদি এ সংবাদ পাই।
তবে নাকি ভূপ এ দেশের জল খাই।
মন স্থির করিলাম হইল ভরসা।
সিংহলেতে ধনপতি নামে এই দশা॥

* * * *
* * * *

পূর্ব্ব দ্রব্য সব পূর্ণ নৌকায় ভরিল।
বিনয় করিয়া রাজা বিদায় করিল॥

* * * *
* * * *

ত্বরিতে নৌকায় উঠি সবে হর্ষমতি।
ভাবি নিজ দেশপ্রতি করিলেক গতি॥
কবি নারায়ণ কহে প্রভুর চরণে।
আপনি হইয়া সর্প ঔষধ আপনে॥"

সওদাগর দেশে পঁহুছিলে, এই সংবাদ তাহার স্ত্রী ও কন্যা অবগত হইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে নৌকাঘাটে ছুটিয়া গেল। ধনপতি তটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উভয়ে তাহার পদে পতিত হইলেন, কিন্তু অকস্মাৎ প্রবল ঝড় উত্থিত হইয়া, চন্দ্রভানের সহিত নৌকা অতল জলে নিমজ্জিত হইল।

কারণ ;—

প্রভুর প্রসাদ পাইয়া, সুনেত্রা করেতে লইয়া,
বসিছিল এমত সময়।
পতি আগমন শুনি, সর্ব্ব হারাইয়া ধনী,
জননীকে লইয়া ধাওয়য়॥
(হরিষে ভোলা হইয়া)
প্রসাদ কোথায় গেল, তাহা নাহি মনে রৈল,
হইয়াছিল পাপ অতিশয়।
পুনঃ প্রভু মহারোষ, করিলা পাইয়া দোষ,
তোষ করা বড়ই সংশয়॥
(কহে কবি ভাবিয়া)

হরির প্রসাদের প্রতি অবহেলা প্রযুক্ত সুনেত্রা পুনরায় পতি হারাইল।

রোদতি নববর নারী হারি করম বিপাকে;
বিষম বিরহ দুঃখ, ভাবিয়া বিদরে বুক,
মুখ হেঁট অতিশয় শোকে।
শোকে কাতর বালা জ্বালা সহিবে কতেক।
ক্ষণে শোকে ধাবতি, পতিত ক্ষণেক...
লম্বিত চিকুর যতেক॥

ভিন্ন ছন্দ (ত্রিভঙ্গী)

ক্ষণে হইয়া মোহিতা, ধনপতি দুহিতা
জননী সহিতা ভূমে পড়ি।
পতি-শোক-সাগরে, না দেখি নাগরে,
ফিরে যেন নাগরে ডাক ছাড়ি॥
হইয়া জীবনশেষা, বিগলিতকেশা,
লটপটকেশা ভূমি ধরি।

শোকে হইয়া বিমনা, যমপুরে গমনা,
মনে এই ভাবনা স্থির করি ॥
নাথ নাথ বলিয়া, কান্দি পড়ে ঢলিয়া,
কোথা গেলা ছাড়ি নাথ মোরে।
উঠ ফিরি ভাসিয়া, কথা কহ আসিয়া,
মোর শোক নাশিয়া আস ঘরে ॥
ভাবি কি করিব, হরি পরে মরিব,
সহিতে নারিব নারী হইয়া।
মরণারে গণি না, যমপুর চিনি না,
কার মুখে শুনি না তত্ত্ব লইয়া ॥
এ দারুণ বিরহে, তনু মোর না রহে,
প্রাণে আর না সহে শোক-জ্বালা।
ঝাঁপ দেই সলিলে, হরি মোরে ছলিলে,
যাবে দুঃখ মরিলে দগ্ধ বালা ॥
যায় প্রাণ দহিয়া, না পারি সহিয়া,
কি করি কহিয়া মার কাছে।
হরি দয়া করিয়া, নিজগুণ স্মরিয়া,
যদি তোল ধরিয়া প্রাণ বাঁচে ॥
শোকে ভেদ সজ্জা, দূরে রাখি লজ্জা,
করি ভূমিশয্যা, পদ্ম-আঁখি।
বলে হায় বিধিরে, জ্বলি যায় হৃদি রে,
হরিলীলা নিধিরে না দেখি ॥
কেন প্রাণ যায় না, প্রিয় পাছে ধায় না,
বুঝি পথ পায় না নিরখিতে।
কে করে প্রতীক্ষা, করিবারে ভিক্ষা,
না পাইলে শিক্ষা এই মতে ॥
সুনেত্রার ও তদীয় পিতামাতার বিলাপে ও মিনতিতে

সত্যনারায়ণের দয়া হইল। তখন স্বপ্নযোগে সুনেত্রাকে বলিলেন, আমার প্রসাদ ফেলিয়া দিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, এইজন্য তোমাকে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, এখন সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ কুড়াইয়া মুখে দাও, তবেই পুনরায় পতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আদেশ মাত্র প্রতিকারের ব্যবস্থা হইল। তরীসহ চন্দ্রভানও ভাসিয়া উঠিল।

তরণী আসিয়া লাগিল কূল।
বাড়িল আনন্দ কি দিব তুল।
রচিত শোভিল সব অমূল।
কবির সরস ভাষেতে॥
কাটি দুঃখ দিবা তিমির ঘোর।
নব চন্দ্রভান করিয়া জোর
উঠিল তটেতে হইল সোর (১)
নাগর হাসিতে হাসিতে॥
বিরহ-রজনী প্রভাত বায়
ছুটিল নবীন নলিনী তায়
কবি কহে দেখি অরুণ বায়
উদিত যোষিত বাসেতে।
হরি হরিলীলা মায়ার জাল।
পতি দেখি সতী অতি রসাল!
সঙ্গ ভঙ্গ দিন বিরহ কাল।
অবলার শোক নাশিতে॥
আগত দয়িত সহিত দেখা
খণ্ডিল বিধির বিরহ লেখা
প্রকাশিল চাঁদ সদয় সখা
কুমুদিনীকুল প্রকাশিতে॥

(১) সোর—গণ্ডগোল।

নহে সরিয়া কচিয়া কাম
করিয়া অবলা হৃদয় ধাম
জাগাইতে পুনঃ আপন নাম
লাগিল স্বদেশ শাসিতে।
কবি কহে দীনবন্ধুর খেলা
অতি দূরে গেল অশেষ জ্বালা
সুস্থির হৃদয় হইল বালা
সম্মুখে পাইয়া দয়িতে॥

এই প্রকাণ্ড কাব্যগ্রন্থের অতি সামান্য অংশমাত্র আমরা পাঠক-মহোদয়গণকে উপহার দিতে পারিলাম। হয় ত যেটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, উহা পাঠ করিতেই অনেকের বিরক্তি বোধ হইয়া থাকিবে। আমরা কিন্তু আরও উদ্ধৃত করিতে পারিলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম। পিতৃপুরুষের সামান্য স্মরণ-চিহ্নও যখন মানবের পক্ষে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে, তখন এই কাব্যগ্রন্থগুলি আমাদের নিকটে অমূল্য নিধি বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। আমাদের পক্ষে উহার সমালোচনা যুক্তিযুক্ত নয়, পাঠকগণ যাহা করিতে হয়, করিতে পারেন। জয়নারায়ণের প্রতিভা হরিলীলাতে আরম্ভ হইয়া, চণ্ডিকামঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা ও রচনার পারিপাট্যও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। আমরা অতঃপর চণ্ডিকামঙ্গল হইতে এইরূপ মাল্য সংগ্রহ করিয়া পাঠকমহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিতে প্রয়াস পাইব।

অতঃপর আর একটা কথা এইস্থানে বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করি। হরিলীলা-গ্রন্থে কবি জয়নারায়ণ আপন বিদুষী ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী বিরচিত কতিপয় রচনার সমাবেশ করিয়াছেন, আমরা এইস্থানে উহা সন্নিবেশ করিলাম না। যদি সম্ভব হয়, ভিন্ন প্রবন্ধে সেই বিদুষীর সমুদয় রচনা সমাবেশ করিতে যত্নপর হইব।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

মহাজনপদাবলী ও রসকীর্ত্তন

সচরাচর আমরা যেমন করিয়া কবিতা পড়ি, সেরূপভাবে বৈষ্ণব-কবিতা কেবল পড়িয়া গেলে তার সকল মর্ম্ম গ্রহণ বা রস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। মহাজনপদাবলী কেবল কবিতা নহে, গান। আগে পদকর্ত্তাগণ পদ রচনা করিয়াছিলেন, পরে গায়কেরা তাহাতে সুরলয় যোগ করিয়া দিয়াছেন, এমনও নহে। অথবা আধুনিক কবিদের মতন ইঁহারা আগে কোনও সুর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, পরে গুন্ গুন্ করিয়া ঐ সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে তার উপযোগী শব্দ যোজনা করিয়া এ সকল গান রচনা করিয়াছেন, তাহাও নয়। বাক্য আর অর্থ যেমন যুগপৎ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মহাজনপদাবলী একই সঙ্গে শব্দ ও সুর লইয়া জন্মিয়াছে। শব্দ আগে, না সুর আগে; এখানে এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না।

আর জন্ম হইতেই এগুলি গান বলিয়া, মহাজনপদাবলী সাধারণ কবিতার মতন কেবল পড়িয়া গেলেই চলে না। এরূপ পড়াতে এ সকলের সমগ্র সত্য শক্তি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় না। পদাবলী কীর্ত্তন শুনিতে হয়। প্রথম-যৌবনাবধিই ত মহাজনপদাবলী পড়িতেছিলাম। বিদ্যাপতি চণ্ডীদা'সের পদগুলি কত, কত বার, পড়িয়াছিলাম। আর যত পড়িতাম ততই মিষ্ট লাগিত। কিন্তু রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার মুখে এ সকল পদ যখন শুনিলাম, তখন ইহাদের যে অদ্ভুত অপার্থিব সৌন্দর্য্যসম্পদের সন্ধান পাইলাম, পূর্ব্বে তাহা পাই নাই।

কেবল সুরলয়ের গুণেই যে এমন হইল, ইহাও বলিতে পারি না। গানের অর্থের সঙ্গে তার সুরলয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ,

আকস্মিক নহে কিন্তু অঙ্গাঙ্গী ও অপরিহার্য্য, একথা মানি। কিন্তু যে-সে সুরে, সে সুর যতই কেন মিষ্ট হউক না, এ সকল পদাবলী গাহিলে তার সম্পূর্ণ রস আস্বাদন করা যায় না। যে পদের সঙ্গে প্রাচীনকাল হইতেই যে সুরটি যুক্ত হইয়াছে, সেই সুরটি ছাড়া অন্য সুরে গাহিলে সে পদের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই সচরাচর কলিকাতা অঞ্চলে যেসকল স্ত্রীলোকে পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মুখে এগুলি তেমন ফোটে না। বর্ষীয়সীদের মুখে একটু আধটু ফুটিলেও যুবতীদের মুখে আদৌ ফুটিয়া উঠে না। থিয়েটারেও কীর্ত্তন গাওয়া হয়। সেখানেও এ জিনিষ ফোটে না। যাঁহারা গুরুপরম্পরায় রীতিমত এসকল কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল মহাজনপদাবলী গাহিয়া তার নিগূঢ় অর্থ ও রস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

এটি কেন হয়, ইহা বুঝিতে হইলে রসতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যার সম্বন্ধের আলোচনা করিতে হয়। একদিকে রসশাস্ত্রে ও অন্যদিকে সঙ্গীতবিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী তাঁরাই এ আলোচনা করিবার অধিকারী। এই অধিকার না থাকিলেও, রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুর-তালের যে একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলা যাইতে পারে। সুর-তালের একটা শব্দবিজ্ঞানের বা acoustics'এর দিক্ আছে। গত কার্ত্তিক সংখ্যায় "নারায়ণে" শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র মহাশয় এটি দেখাইয়াছেন। সুর তালের আর একটা দিক্‌ও আছে; সেটা ভাবের বা রসের দিক্; এই দিকে সঙ্গীতবিদ্যার সঙ্গে শারীর-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। রসানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে ও শরীরের পেশিসমূহে এবং শরীরাভ্যন্তরস্থ হৃদযন্ত্রে ও ফুসফুসে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার প্রকাশ হইয়া থাকে। স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের এই সকল ক্রিয়ার ফলে আমাদের দেহেতে কামক্রোধাদির বিশিষ্ট রূপ বা মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। পশুদিগের

মধ্যেও স্নায়ু, পেশি, হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসসম্পর্কিত এসকল ক্রিয়ার প্রকাশ হইয়া থাকে। কামক্রোধাদিতে পেশির ক্রিয়া হইয়া আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে বিকার উৎপাদন করে, চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে তাহারই অনুসরণ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রসমূর্ত্তির সৃষ্টি করে। এসকল ভাবের বা রসের প্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসে যে ক্রিয়া হয়, সঙ্গীতবিদ্যা তাহাকে আশ্রয় করিয়াই, সুর-তাল যোজনার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রসমূর্ত্তির প্রকাশ করে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা যেসকল রাগরাগিণীর মূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাকে নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি না সন্দেহ। আর এসকল রাগরাগিণী মূর্ত্তি নিতান্ত কল্পিত হইলেও, সুর-তালের সঙ্গে যে আমাদের অন্তরের ভাব ও রসের একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সকল সুরের সঙ্গে যে সকল ভাবের মিল হয় না। কোনও কোনও সুর ও তাল করুণ-রসোদ্দীপক, কোনও কোনও সুর বা হাস্যরসোদ্দীপক, কোনওটা বা বীররসোদ্দীপক হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষ কথা। বৈষ্ণবপদাবলীতে যতটা পরিমাণে রসে ও সুর-তালে সঙ্গতি আছে, সাধারণ গানে তত আছে কি না, জানি না। শব্দ, অর্থ ও ছন্দ মিলিয়া সাধারণ কবিতার মর্ম্ম প্রকাশ করে। বৈষ্ণব-কবিতাতে শব্দ, অর্থ ও ছন্দ ছাড়া সুর ও তাল মিলিত হইয়া তবে তার সম্পূর্ণ মর্ম্মটি ব্যক্ত করিয়া থাকে। শব্দ, অর্থ, সুর ও তাল, ইহাদের কোনওটিকে বাদ দিলে, এ সকল পদাবলীর পরিপূর্ণ স্বরূপ ও সৌন্দর্য্যটি পাওয়া যায় না। শব্দে ও অর্থে বৈষ্ণব-কবিতার প্রাণের অর্দ্ধেকটুকু মাত্র ব্যক্ত করে। এই অর্দ্ধও তার পরার্দ্ধ নহে, কিন্তু অপরার্দ্ধ মাত্র। এইজন্যই মহাজনপদের নিগূঢ় মর্ম্ম ও রস গ্রহণ করিতে চাহিলে কীর্ত্তন শোনা অত্যাবশ্যক।

যে-সে কীর্ত্তনীয়ার মুখে শুনিলেও চলিবে না। কীর্ত্তন শুনিতে হয় প্রকৃত রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার মুখে। সকল কীর্ত্তনীয়াই বৈষ্ণব-রস-

শাস্ত্র পড়িয়া থাকেন। ভাগবতের কিয়দংশ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং উজ্জ্বলনীলমণি ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু* প্রভৃতি বৈষ্ণব-রসতত্ত্বের প্রামাণ্য গ্রন্থাদি সকলকেই কমবেশী পড়িতে হয়। আর এ সকল শাস্ত্র খুব বেশী জানা থাকিলেই যে লোকে সত্য রসজ্ঞ হয়, এমনও নহে। রসশাস্ত্রজ্ঞ আর রসজ্ঞ এক কথা নহে। রসশাস্ত্রজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া অপেক্ষা প্রকৃত রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া কম দেখিতে পাওয়া যায়। রসের কথা কেতাবে পড়িয়াই অনেকে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া থাকেন। কিন্তু নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে সখ্যবাৎসল্যাদি রসের সাক্ষাৎকার সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যার ঘটে নাই, শাস্ত্র পড়িয়া সে কথাই শিখিবে, বস্তু চিনিবে না। রসের শাস্ত্র ত আকাশ হইতে উড়িয়া আসে নাই। কোনও শাস্ত্রই আকাশসম্ভূত নহে। রসিকজনের প্রত্যক্ষ রসানুভূতির উপরেই রসতত্ত্বের বা রসশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সখ্যবাৎসল্যাদি রসের প্রভাবে মানুষের শরীরমনে, এবং বহিঃপ্রকৃতির ও অপর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধে যে সকল অবস্থা বা বিকার ঘটিয়া থাকে, তাহার আশ্রয়ে, তাহার ভিতরকার সার্ব্বজনীন বিধিবিধানাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াই, যাবতীয় রসশাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, প্রভৃতির বিচার ও বর্ণনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর এই অনুভূতির চাবি দিয়াই রসশাস্ত্রের ও রসতত্ত্বের নিগূঢ়তম ভাণ্ডার খুলিতে হয়। ইহার আর কোনও চাবি নাই। কেবল ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্গে করিয়া শাস্ত্রের অর্থ উদ্‌ঘাটন করা যায় না; রসশাস্ত্রের নহে, অন্য শাস্ত্রেরও নহে। রসের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই রসশাস্ত্রের সত্য অর্থ বুঝিতে পারেন। নিজেদের অনুভূতি দ্বারা তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্মপ্রকাশ করেন। শাস্ত্রের দ্বারা নিজেদের অনুভূতির স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণাদির জ্ঞানলাভ করেন। নিজেদের রসানুভূতির দ্বারা যাঁহারা রসশাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন, আর রসশাস্ত্রের দ্বারা যাঁহারা নিজেদের অনুভূতির পরীক্ষা করিয়া তার ভিতর-

কার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহারাই রসজ্ঞ। এইরূপ রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার মুখেই মহাজনপদাবলী শুনিতে হয়।

মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনকে রসকীর্ত্তন কহে। আমাদের এই রসকীর্ত্তন বস্তুটি অতি অদ্ভুত। ইহা কেবল সঙ্গীত নহে; অথচ ইহাতে সঙ্গীত আপনার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। ইহা নাট্যাভিনয় নহে; অথচ ইহাতে নাট্যাভিনয়ের প্রাণ-বস্তুটি ফুটিয়া উঠে। ইহা একাধারে আবৃত্তি, ব্যাখ্যা, গান ও অভিনয়। এসকল রসকীর্ত্তনে সঙ্গীতকলা ও নাট্যকলার অন্তরতম প্রাণবস্তু যেন পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়। রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়া যখন ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, "শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের" কৃপার প্রেরণা পাইয়া, এ সকল পদাবলী কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার নিজের দেহেতে যেন প্রত্যেকটি পদের রস মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ফলতঃ রসকীর্ত্তন করা যার তার সাধ্য নাই। যাকে তাকে সাজেও না। মহাজনপদকর্ত্তাগণ সর্ব্বদাই "সখীভাব" অঙ্গীকার করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সখীভাবই সত্য পরকীয়া ভাব। সখীগণের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজের কোনও দেহ-সম্বন্ধ নাই, সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহারা লীলাপর নহেন। শ্রীরাধার সঙ্গে একাত্ম হইয়া, রাধাভাবভাবিত দেহমনপ্রাণ লইয়া, ইঁহারা কৃষ্ণলীলা-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। হীনবুদ্ধি লোকের হাতে এই পরকীয়া শব্দটি অতি জঘন্য অর্থলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনের পরকীয়ার আদর্শ বস্তুতঃ এরূপ হীন নহে। খৃষ্টীয়-সাধনে ও খৃষ্টীয়ান্ মুক্তিতত্ত্বে যাহাকে vicarious বলিয়াছে, বৈষ্ণব-সাধনার পরকীয়াও বস্তুতঃ তাহাই। যীশুখৃষ্ট নিজে নিষ্পাপ হইয়াও, আপনার মস্তকে জগতের সকল পাপের বোঝা গ্রহণ করিয়া, আপনি জগতের পাপীসমাজের জন্য জীবন দিয়া তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। নিজে নিষ্পাপ হইয়াও অপরের পাপের বেদনা আপনি গ্রহণ করিলেন। এটি পরকীয়া (vicarious)। প্রেম মাত্রেই এই পরকীয়া-বৃত্তির অনুসরণ

করিয়া চলে। আপনার সুস্থশরীরে স্নেহময়ী জননী রুগ্ন সন্তানের রোগ-যাতনা অনুভব করেন। পিতা অপরাধী পুত্রের লাঞ্ছনার ভার আপনার প্রাণে বহন করেন। আবার জনকজননী পুত্রকন্যার সুখসম্পদেও আপনারা সুখী হইয়া থাকেন, এসকলই vicarious বা পরকীয়া। মার্কিণ কবি এমার্সন্ এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

I thank ye, oh young excellent lovers, ye keep the world young for me.

যুবলদম্পতির প্রেমাভিনয় দেখিয়া বৃদ্ধ সুরসিকেরা আপনাদের যৌবন যেন ফিরাইয়া পান,—ইহাও পরকীয়ারই লীলা। নিষ্কাম প্রেম মাত্রেই পরকীয়াবৃত্তি অবলম্বন করে। বৈষ্ণব-শাস্ত্র ও বৈষ্ণব-সাধনা, বৈষ্ণব-কিম্বদন্তী ও বৈষ্ণব-কবিতা ব্রজগোপীগণকে নিষ্কামপ্রেমের অবতার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটিসুখ পায়॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

বৈষ্ণবপদকর্ত্তাগণ এই অপূর্ব্ব সখীভাবেভাবিত হইয়াই রাধা-কৃষ্ণের লীলা অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া ভাষায় ও গীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের পদাবলীর নিগূঢ় অর্থ ব্যক্ত করিতে হইলে, কীর্ত্তনীয়াকেও এই সখীভাবটি সাধন করিয়া, আপনার অন্তরে এই অপূর্ব্ব লীলারস প্রত্যক্ষভাবে আস্বাদন করিতে হয়। নতুবা পদাবলীর নিগূঢ় মর্ম্ম ও সত্য রস কিছুতেই ফুটাইতে পারা যায় না।

কিন্তু এই সখীভাবও প্রত্যক্ষ রসের সম্বন্ধের আশ্রয়েই সাধন করিতে হয়। নতুবা তাহা বন্ধ্যার পুত্রস্নেহের মতন নিতান্ত কল্পিত ও অলীক হইয়া পড়ে। প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে প্রেমের সাধন করিয়াই যে এই রসের সার্ব্বজনীন মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভনিতাই অনেক সময় তার সাক্ষী দিয়া থাকে। জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী বা রামমণি এবং সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির লক্ষ্মীবাই, সাক্ষাৎ রসানুভবের বিশিষ্ট আধার ও আশ্রয় ছিলেন। পরবর্ত্তী কবিগণ সম্বন্ধে এরূপ কোনও অকাট্য প্রমাণ নাই। কাহারও কাহারও রস যে অনেকটা কল্পিত, ইহাও অস্বীকার করা কঠিন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতেই এসকল পদাবলী একটা অতিঅপ্রাকৃত, তথাকথিত আধ্যাত্মিক অর্থলাভ করিয়া, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যক্ষ রসাশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এই কারণেই, যত দিন যাইতে লাগিল, ততই বৈষ্ণব-পদাবলীও পূর্ব্বিকার অপূর্ব্ব বস্তু-তন্ত্রতা হারাইতে আরম্ভ করিল। এইজন্যই প্রাচীন পদাবলীর যা কিছু সত্য ও শক্তি ও সৌন্দর্য্য আছে, বর্ত্তমানে তাহার আধুনিক টীকাকার বা আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতাদের নিকটে তাহা পাওয়া যায় না; মিলে কেবল রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়াদের মুখে।

পুরাতন কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত শারদাচরণ মিত্র মহাশয় "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ" প্রকাশ করিয়া আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বৈষ্ণব-কবিতার অনুশীলনের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্রমে আরও অনেকে মহাজনপদাবলীর নব নব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। অল্প-দিন হইল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদও এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এইরূপে নানাদিক দিয়া বৈষ্ণব-কবিতার পুনরালোচনা আরম্ভ হই-য়াছে। অনেকেই এসকল কবিতা পড়িয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত গণেশ-

চন্দ্র দাসের মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া অবধি কলিকাতার ইংরাজিশিক্ষিত সমাজে মহাজনপদাবলীর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, এই চল্লিশ বৎসরকাল কেবল বৈষ্ণব-কবিতা পড়িয়া তাহা হয় নাই। কবিতা পড়িয়া আমরা শব্দার্থ মাত্র জানিয়াছিলাম। তাহাতেই এই সকল কবিতা যে কত মিষ্ট ইহা বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু প্রকৃত বস্তুজ্ঞান লাভ হয় নাই। গণেশ দাস এই সকল পদাবলীর ভিতরকার প্রাণবস্তুকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একেবারে চক্ষের উপরে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁর কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব বৃন্দাবন-লীলাটি যেন অঙ্কে অঙ্কে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, এসকল আর কেবল কবিকল্পনা রহিল না, অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে যেন পুনরায় জীবন্ত হইয়া উঠিল। কেবল পদাবলী পড়িলে এটি হয় না।

তারপর, এসকল কীর্ত্তন যেভাবে সাজান হয়, তাহাতেও পদের ভিতরকার বস্তুটিকে ফুটাইয়া তুলে। সাজান পালাতে মহাজনপদ পড়িবার ও শুনিবার ইহাও একটি বিশেষ প্রয়োজন। সকলেই যে পালা সাজাইতে পারে, এমনও নহে। রসজ্ঞ না হইলে কেহ সুন্দররূপে এ কাজটি করিতে পারে না। আর প্রাচীন পালাগুলি সকলই যে রসজ্ঞ ভাবুকের সাজান, এমনও মনে হয় না। কোনও কোনও কীর্ত্তনীয়ার মুখে এমন সকল পালা শুনিয়াছি, যাহাতে রসের ঐক্য ও স্বাভাবিকতা রক্ষা পায় নাই। স্থানে স্থানে দুঃসহ রসভঙ্গ হইয়াছে। যেখানে যে পদ বসে না, সেখানে সেপদ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন পদসংগ্রহেও সকল সময় ভিন্ন ভিন্ন পালার অন্তর্গত পদসকলের মধ্যে যথাযোগ্য পৌর্ব্বাপর্য্য ও সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত গণেশ দাসের মুখে যে-সকল পালা শুনিয়াছি, তাহা যেরূপভাবে সাজান, সকল কীর্ত্তনীয়ার পালা ঠিক সেভাবে সাজান নহে। বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে যেমন গাছ পরপর ফুটিয়া উঠে, রসবস্তুও আমাদের অন্তরে

সেইরূপ স্তিলে স্তিলে ফুটিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠতম মহাজনগণের কবিতার প্রত্যেকটি রস, এরূপভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও পদাবলীতে বা রসবিশেষের বীজাবস্থা, কোনওটিতে বা অঙ্কুরাবস্থা, আর কোনওটিতে বা একেবারে উজ্জ্বল প্রস্ফুট অবস্থা ফুটিয়াছে। পালা সাজাইবার সময় রসের এই ক্রমবিকাশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তনীয়াদের মুখে যে সকল পালা শোনা যায়, তাহাতে রসের এই বিকাশক্রমটি বেশ ফুটিয়া উঠে। মামুলী কীর্ত্তনীয়াদের পালাতে সকল সময় এটি দেখিতে পাওয়া যায় না।

এক একটি পালাতে এক একটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ হয়। ফলতঃ এক একটা রস ধরিয়া সেই রসের ক্রমবিকাশ কিরূপে হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অনুরূপ পদাবলী যোজনা করিয়া, সেই রসের বিভিন্ন অবস্থা ও প্রকাশকে যথাযোগ্যভাবে এক সূত্রে গাঁথিয়া একটি পরিপূর্ণ রসমূর্ত্তির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করাই পালা সাজাইবার মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যই পালা ধরিয়া মহাজনপদের অনুশীলন করিলে যেভাবে তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ও অনুপম সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম ও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, কেবল পড়িলে তাহা করা যায় না। আর এই জন্যই সকলের আগে ভিন্ন ভিন্ন রসকে পৃথক পৃথক করিয়া, তাদের নিজ স্বরূপে তাহাদেরে দেখা আবশ্যক।

আমাদের বৈষ্ণব মহাজনগণ বিশেষভাবে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রসেরই চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। গোষ্ঠলীলাতে সখ্য ও বাৎসল্য বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সত্য, কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর অতিসামান্য অংশে মাত্র এই লীলা বর্ণিত ও চিত্রিত হইয়াছে। এসকল পদাবলীর মুখ্য আশ্রয় সখ্যও নহে, বাৎসল্যও নহে, কিন্তু মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যকে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বে সকল রসের সেরা বলিয়াছেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এগুলি মাধুর্য্য অপেক্ষা ছোট; মাধুর্য্যেতে দাস্যসখ্যবাৎসল্য আছে, কিন্তু দাস্যাদিতে মাধুর্য্য নাই। এক অর্থে দাস্য, সখ্য, এবং বাৎসল্যও মাধুর্য্য-পর্য্যায়ভুক্ত; এই তিন রসের

কোনওটিতেই পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাব থাকে না। দাস্যেতে অতি সামান্ত পরিমাণে থাকিলেও, সখ্য ও বাৎসল্যেতে একেবারেই থাকে না। দাস্যের প্রাণ সেবা। আর এই সেবার প্রয়োজনে দাস যখন-তখন প্রভুর প্রতি প্রভু বলিয়া যে মর্য্যাদা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন, বিনা অপরাধে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। প্রেম মাত্রেই ঐশ্বর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। এই জন্যই দাস্যাদিও মাধুর্য্যপর্য্যায়-ভুক্ত হইয়াছে। আর দাস্য হইতে যাহাকে আমরা বিশিষ্ট মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রস বলি, তাহা পর্য্যন্ত, এই চারিটি রসেই দেহাশ্রয় ও দেহের অপেক্ষা রাখে। প্রকৃত দাস্যরসেতে প্রভুর দেহ দাসের নিকটে অতি প্রিয় হইয়া থাকে। সে দেহ দাসের ভোগের বিষয় নহে, কিন্তু সেবার ও পূজার বস্তু। প্রভুদেহ সংস্পর্শে দাসের পুলকাদি সাত্বিকী বিকার হয়, না হইলে, অথবা যতক্ষণ না হইয়াছে ততক্ষণ, তাহা দাস্য রস হয় না। সখ্যে ও বাৎসল্যেও যে এই দেহসম্বন্ধ আছে, ইহা বলা বাহুল্য। সখার অঙ্গস্পর্শে সখার, সন্তানকে বুকে চাপিয়া মাতার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত, শিরায় শিরায় অপূর্ব্ব ভাব-প্রবাহ ফুটিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। আর দাস্য হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎসল্য পর্য্যন্ত এই রসত্রয়ে যে দেহ-সম্বন্ধ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতর ও অন্তরতর হইয়া উঠে, মাধুর্য্যে বা শৃঙ্গার রসেতে তাহাই পরিপূর্ণভাবে ও নিঃশেষে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এই দেহ-সম্বন্ধেরও একটা বিশেষত্ব আছে। ইহা দেহকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া সেই দেহকে আবার অতিক্রম করিয়া যায়। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি হয়। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই রসচতুষ্টয়ের অধিকারের বাহিরে, অপর কোনও সম্বন্ধেতে বা রসে এই অপরিহার্য্য ও সার্ব্বজনীন ভাবটি থাকে না। বৈষ্ণব মহাজনগণ এই সকল রসচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের পদাবলীতে শারীর ধর্ম্মের অমন বাহুল্য বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এসকল শারীর ধর্ম্ম মহাজনপদাবলীতে সর্ব্ব-

দাই দেহ-সীমাকে অতিক্রম করিয়া, চিন্ময় রসরাজ্যে যাইয়া মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল শরীর, কেবল রক্তমাংস, কেবল হীন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বলিয়া কোনও কিছু শ্রেষ্ঠতম মহাজনপদাবলীতে পাওয়া যায় না। মাধুর্য্য বা শৃঙ্গারই মহাজনপদাবলীর প্রাণ। এই মাধুর্য্যের তিনটি মুখ্য অবস্থা—পূর্ব্বরাগ, মিলন, ও বিরহ। বৈষ্ণবপদাবলীর এই তিনটিই মুখ্যতম রসধারা। এই তিনটি মুখ্য ধারাতেই বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণ রসশাস্ত্র-বর্ণিত চৌষট্টি রসকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।))

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মায়াবতী পথে

[৪]

পিউড়া হইতে আলমোরা আট মাইল পথ। এই আট মাইল পথ অতিক্রম করিতে আমাদের অধিকক্ষণ সময় লাগিল না; কারণ প্রথমতঃ পিউড়া হইতে আলমোরার পথে কোন স্থলে তেমন ‘চড়াই’ কিম্বা ‘উৎরাই’ নাই যাহাতে পথচলার বিলম্ব ঘটিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ শরৎকালের স্নিগ্ধ শীতল প্রভাতকালে কুলিগণ ইচ্ছা করিয়াই দ্রুত চলিতেছিল।

পিউড়া হইতে আলমোরা পথের দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ সুদৃশ্য সবুজ রঙ্গের পাইন বৃক্ষের শ্রেণী। আমাদের দক্ষিণে ও বামে যতগুলি পর্ব্বত আমরা অতিক্রম করিয়া আসিলাম প্রায়

সবগুলিই দেখিলাম পাইন বৃক্ষের দ্বারা সজ্জিত। কোন পাহাড়ে অতিপুরাতন বৃক্ষসমূহ বহু উর্দ্ধে গগন ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান, কোনটিতে তরুণ বৃক্ষরাজি প্রভাত-সূর্য্যকিরণে যৌবন-স্বপ্ন দেখিতেছে এবং কোনটিতে বা পাইন শিশুগণ সবে মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক জায়গায় দেখিলাম অধিকাংশ পাইন গাছের পাদদেশে খানিকটা করিয়া ছাল কাটিয়া দিয়া তাহার মুখে আমাদের দেশে খেজুর গাছে যেমন ভাবে ভাঁড় বাঁধা হয়, তেমিন ভাবে একটি করিয়া ভাঁড় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ছিন্ন স্থল হইতে একপ্রকার গাঢ় নির্যাস ক্ষরিত হইয়া ভাঁড় পূর্ণ হইয়া যায়। পরে এই নির্যাস হইতে তারপিন তেল প্রস্তুত হয়।

এই সকল পাইন বনের অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অরণ্য। ইহার বৃক্ষসমূহের কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে আইন অনুযায়ী তাহার দণ্ড বিধান আছে। অনেক স্থলে আগুন জ্বালা এমনকি চুরুট খাওয়া পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এই সকল অরণ্য পর্য্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বহুসংখ্যক প্রহরী আছে; ইহারা সর্ব্বদা এই সকল অরণ্যে পাহারা দেয় এবং কোন লোককে আইনবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে দেখিলে পুলিশে ধরিয়া লইয়া যায়। এই প্রহরীগণকে প্যাট্রোল বলে। ডাণ্ডিওয়ালা ও কুলিগণ এই প্যাট্রোলগণের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত।

বেলা ১০টা আন্দাজ আমরা আলমোরা নগরের সীমান্তে উপস্থিত হইলাম। এই স্থলে একটি পাহাড়ীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল; সেও আলমোরা অভিমুখে চলিয়াছিল। একটি বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র হস্ত ও মুখের সাহায্যে বাজাইতে বাজাইতে সে পথ চলিতেছিল। যন্ত্রটি তাহার নিতান্ত সামান্য এবং সেই যন্ত্র হইতে যে শব্দ নির্গত হইতেছিল তাহাও নিতান্ত ক্ষীণ। কিন্তু সেই অকিঞ্চিৎকর যন্ত্রটি হইতে, দেশকালপাত্রের গুণে কি না বলিতে পারি না, একটি অপূর্ব্ব ও মধুর স্বরলহরী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী গতের রূপে নির্গত হইয়া

আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল। সে চলিতেছিল পদব্রজে; আমরা চলিতেছিলাম ডাণ্ডিতে দ্রুতগতিভরে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তাহাকে ও তাহার স্বরলহরীকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কিন্তু মনের মধ্যে ইচ্ছা হইতেছিল একটু অপেক্ষা করিয়া তাহার বাজনা শুনি।

আলমোরায় প্রবেশ করিয়া ডাকবাংলায় পৌঁছান পর্য্যন্ত সহরের যেটুকু অংশ অতিক্রম করিলাম, দেখিলাম অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সজ্জিত। এত অধিক পরিচ্ছন্ন যে আর একটু অপরিচ্ছন্ন হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না। পথে জঞ্জাল নাই, ধূলা কাদা নাই, এমন কি একটি কাগজের টুক্‌রা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। পথের পাশে ক্রোটান গাছগুলি এমন পরিপাটি করিয়া ছাঁটা ও ফুলের গাছগুলি এমন মানাইয়া মানাইয়া বসান যে ড্রয়িং রুমের মধ্যে সেগুলিকে স্থান দিলেও ত্রুটি বাহির করিবার উপায় ছিল না। গৃহ ও গৃহ-অঙ্গনগুলি এমন ঝাড়া পোঁছা তক্‌তকে এবং ঝক্‌মকে যে দেখিয়া মনে হয় সেগুলি ব্যবহারের জন্য নহে, শুধু শোভার জন্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পথে গাড়ীঘোড়া নাই, জীবজন্তু নাই, এমন কি লোকজনও অতি অল্প। গৃহগুলির অধিকাংশ সযত্নে নিরুদ্ধ। গৃহবাসিগণ বোধ হয় নিম্নে নামিয়া গিয়া থাকিবেন।

এই নিখুঁত পরিচ্ছন্ন এবং কতকটা নির্জ্জন নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের মধ্যে অমিশ্র আনন্দ এবং আরাম পাওয়া গেল না। এরূপ কায়দাদোরস্ত ঠিক্‌ঠাকের মধ্যে নিজেকে অবস্থিত করিলে অনেক সময়ে মন যেন হাঁফাইয়া উঠে—মনে হয় এই অখণ্ড যথা-যথতার সহিত নিজের সহজ ও অবিন্যস্ত অভ্যাস ও প্রকৃতিকে কোন-মতে খাপ খাওয়ান যাইবে না। যেন ইহার মধ্যে সচ্ছন্দ ও সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় পাওয়ার পরিবর্ত্তে বেখাপ্পাভাবে ইতস্ততঃ খট্‌খট্‌ করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেই হইবে। অভ্যাসের দ্বারা আমরা আমাদের প্রকৃতিকে এমন অপরিবর্ত্তনীয়রূপে গড়িয়া তুলি যে, অভ্যাসের অতিরিক্ত

কোন প্রকার অবস্থাতেই আমরা স্বস্তিবোধ করি না। সমস্ত জিনিস-কেই আমরা আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী হয় একটা বিশিষ্ট পরিমাণে নয় একটা বিশিষ্ট আকৃতিতে পাইতে ইচ্ছা করি। সেইজন্য তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম, অভাবই হউক বা আতিশয্যই হউক, আমা-দের পক্ষে আরামদায়ক বোধ হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িল। একদল মেছুনী কোন দূরগ্রামে মাছ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। ফিরিবার সময়ে পথে সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় এক গ্রামের জমিদার-গৃহে যাইয়া তাহারা রাত্রির মত আশ্রয় ভিক্ষা করে। জমিদার দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার বহির্বাটীর বারাণ্ডায় তাহাদিগকে নিশাযাপন করিতে অনুমতি দেন। আহারাদি সমাপন করিয়া মেছুনীগণ বারাণ্ডায় শয়ন করিল। বারা-ণ্ডায় টবের উপরে বসান অনেকগুলি সুগন্ধি ফুলের গাছ ছিল। ফাল্গুন মাস; ধীরে ধীরে দক্ষিণা হাওয়া দিতেছিল এবং সেই স্নিগ্ধ হাওয়ায় ফুলের গন্ধে বারাণ্ডাটি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। মেছুনীগণের কিন্তু কোনমতেই ঘুম আসে না; যতই তাহারা ঘুমাইবার চেষ্টা করে, ফুলের গন্ধে কেমন অস্বস্তিবোধ হইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! অগত্যা তাহারা এক উপায় অবলম্বন করিল। তাহাদের মাছের চুবড়ীতে যে সকল মাছের বসন ছিল সেইগুলাকে বাহির করিয়া নিজ নিজ নাসিকার নিকটে স্থাপিত করিয়া শয়ন করিল। তখন আর কোন উপদ্রব রহিল না, তীব্র গন্ধের চাপে ফুলের গন্ধ লোপ পাইল এবং পরিচিত প্রিয়গন্ধে আরাম পাইয়া মেছুনীগণ অনতি-বিলম্বে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিল।

মৎস্যের গন্ধ অপেক্ষা পুষ্পসৌরভ যে মনোরম, মেছুনীগণ তাহা অস্বীকার করে না। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ তাহাদের প্রকৃতি এমনই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে পুষ্প-পরমাণু তাহাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিলেও মৎস্য-পরমাণু তাহাদের নিদ্রা-কর্ষণ করে।

আলমোরায় দুইটি ডাকবাংলা পাশাপাশি সংলগ্ন। ইহার মধ্যে

একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে স্থাপিত এবং প্রশস্ত। আমরা সেই-টিই আমাদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া লইলাম। আলমোরা হইতে মায়াবতীর পথে যাইবার জন্য আলমোরাতে পুনরায় ডাণ্ডি, ঘোড়া, ডাণ্ডিওয়ালা ভারবাহী কুলি প্রভৃতির নূতন করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমাদের সহিত যাহারা আসিয়াছিল তাহারা এখান হইতে কাঠগুদাম ফিরিয়া যাইবে। আমাদের পৌঁছানর কিছু-ক্ষণ পরেই একটি স্থানীয় ভদ্রলোক ডাকবাংলায় আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইনি এখানকার একটি বড় দোকানের সত্বাধিকারী এবং অদ্বৈত-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের একজন উপকারী বন্ধু। আমাদের মায়াবতী যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য অদ্বৈত-আশ্রম ইঁহার উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সন্ধান লইয়া ইনি প্রস্থান করিলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আহারাদি সারিয়া অপরাহ্নে নগরভ্রমণে বহির্গত হইলাম।

আলমোরা আলমোরা জেলার সদর ষ্টেশন। এখানে একটি উচ্চ ইংরাজি স্কুল, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, প্রথম শ্রেণীর একটি ডাকঘর, সরকারী হাঁসপাতাল এবং একটি গুর্খা সন্নিবেশ আছে। একটি জেলার সদর মহকুমা হইলেও শিমলা, দার্জ্জিলিং এমন কি নাইনিতালের তুলনায় আলমোরা নিতান্ত সামান্য। ইউ-রোপীয়দের স্থাপিত কোন দোকান দেখিতে পাইলাম না। দুই তিনটি দেশী লোকের মধ্যশ্রেণীর দোকান দেখিলাম। আলমোরার বাজারটি নিতান্ত মন্দ নহে। নিত্য-প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়।

আলমোরার পথে পথে এবং বাজারে অনির্দ্দিষ্টভাবে খুব খানিকটা ঘুরিয়া যখন ক্লান্তিবোধ হইল, তখন আমরা ডাকবাংলায় ফিরিলাম। ফিরিবার পথে তিন জন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা আমাদেরই উদ্দেশ্যে ডাকবাংলায় যাইতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত। পূজার

ছুটীর অব্যবহিত পূর্ব্বে ইনি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মায়াবতী যাত্রা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির করিবার জন্য ভাগলপুর গিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি আমাদের মায়াবতী যাত্রার সংবাদ পাইয়া আমাদের তত্ত্বাবধায়ক হইয়া মায়াবতী লইয়া যাইবার জন্য শিমলা শৈল হইতে আসিতেছেন; কাঠগুদামেই আমাদের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈবযোগে একদিন বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় ইনি একদিন পরে কাঠগুদামে উপস্থিত হন—এবং তথায় আমাদের আলমোরা হইয়া আসিবার কথা অবগত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত আসিয়া সেইদিন বৈকালে আলমোরায় পৌঁছিয়াছেন। ইঁহার সঙ্গী দুইটিও রামকৃষ্ণ মিশনেরই অন্তর্ভুক্ত। আলমোরায় রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম গড়িয়া উঠিতেছে—ইঁহারা তাহারই উদ্যোগে আলমোরায় বাস করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজনকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। উগ্র গৌরবর্ণ, তীক্ষ্ণ প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী, গৈরিক-বসন-পরিধারী যুবাপুরুষ, মাথায় রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচায়ক টুপি; ইঁহার নাম মহেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী—পূর্ব্ব পরিচয়ে ফ্র্যান্সিস্ জন আলেকজ্যাণ্ডার। ইনি একজন আমেরিকানিবাসী। অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং পরদিন প্রভাতে তিনি যখন পুনরায় আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ডাক-বাংলায় আসিলেন, তখন কতকটা স্থির হইয়া গেল যে আমাদের মায়াবতী পৌঁছানর কিছুদিন পরে তিনিও তথায় যাইবেন।

প্রভাতে চা-পানান্তে আলমোরার বাজারে গিয়া কয়েকটি প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করা গেল। দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া বাড়িয়া একটি কুলির সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছিল। আমাদের বাহ্য অবস্থা ও আন্তরিক বাসনার মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিবার উপক্রম করিতেছিল একটি বিবেচক কুলি বোধ হয় আমাদের নিকটে থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে আমাদের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজী, কুলি চাই?"

মুখে তার মৃদু মধুর হাসি। কহিলাম, "কুলি ত চাই; কিন্তু তোমাকে কোথায় দেখেছি বল ত? তোমার মুখ যে খুব পরিচিত মনে হচ্ছে!" কুলি হাসিয়া কহিল, "কাল আপনারা যখন আস্‌ছিলেন, তখন আমি বাজাতে বাজাতে আস্‌ছিলাম।" তাই ত বটে! এ ত' ঠিক সেই লোকটিই! সেই বিচিত্র বাজনাটি ভাল করিয়া দেখিবার ও শুনিবার জন্য মনের মধ্যে প্রবল বাসনা ছিল। ভগবান যে এমন করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার জুটাইয়া দিবেন, তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। কহিলাম, "তোমার সে বাজনাটি কোথায়?" সে তাহার জামার পকেট হইতে যন্ত্রটি বাহির করিল। ত্রিশূলের মত একটি লোহার ফলক, তাহাতে একটি সূতা বাঁধা—দাঁতের মধ্যে সেটাকে চাপিয়া ধরিয়া হস্তের দ্বারা বাজাইতে হয়। যন্ত্রটি ত' এই, কিন্তু বাজাইবার একটু বিশেষ কৌশল আছে। দ্রব্য বহন করিবার জন্য অপর একটি কুলি নিযুক্ত করিয়া আমরা তাহাকে তাহার যন্ত্র বাজাইতে বলিলাম। সে বাজনা বাজাইল বটে, কিন্তু মোট বহিতে ছাড়িল না—ডাকবাংলা পর্য্যন্ত আমাদের মোট বহন করিয়া আনিল।

আহারাদি করিয়া বেলা ১টার পর আমরা পরবর্ত্তী ডাকবাংলা লম্‌গড়ের জন্য রওয়ানা হইলাম। লম্‌গড় আলমোরা হইতে দশ মাইল দূর। এখান হইতে আমাদের প্রায় সকল বন্দোবস্তই নূতন করিয়া করিতে হইল। মায়াবতীতে যথেষ্ট ডাণ্ডি পাওয়া না যাইতে পারে, সেই আশঙ্কায় আটখানি ডাণ্ডি একেবারে একমাসের জন্য ভাড়া করিয়া লওয়া হইল। মায়াবতী হইতে রওয়ানা হইবার সময়েও এই ডাণ্ডিগুলি আমাদের কাজে লাগিবে। ডাণ্ডিওয়ালা কুলি ও ভারবাহী কুলি সম্বন্ধে কিন্তু এখান হইতে নিয়ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কুলি এজেন্সীর কুলি লইলে প্রত্যেক ষ্টেজে কুলি বদল করিতে হয়। অতিরিক্ত পারিশ্রমিক এবং পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াও এই সকল কুলিকে এক ষ্টেজের অধিক লইয়া যাওয়া যায় না। অথচ কুলি-এজেন্সী ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বহু কষ্টে আমরা মাত্র বার তেরটি কুলি সংগ্রহ

করিতে সক্ষম হইলাম, যাহারা বরাবর মায়াবতী পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকৃত হইল। অবশিষ্ট সমস্ত কুলি কুলি-এজেন্সীর—ইহারা পরবর্ত্তী ষ্টেজে যাইয়া খালাস হইবে। সেখান হইতে পুনরায় নূতন দল সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য সংগ্রহ করিবার ভার এজেন্সীর উপর। আলমোরা হইতে আমাদের রওয়ানা হইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া এজেন্সীর দুইজন চাপরাশী লম্‌গড় চলিয়া গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় প্যাটওয়ারীর সাহায্যে তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে আমাদের জন্য যথাসম্ভব কুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।

ডাকবাংলা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া খানিকটা গিয়া আমরা আল-মোরা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কুলি ডাণ্ডি ও ঘোড়ার পদশব্দে বাজারের পাথর-বাঁধান পথ সচকিত হইয়া উঠিল। পিচ্ছিল পাথরের উপর ঘোড়ার পা ক্ষণে ক্ষণে পিছলাইতেছিল—তাহাও যেন একটা অভিনবত্বের সৃষ্টি করিতেছিল। পথের দুই সারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণের এবং দ্বিতলপ্রকোষ্ঠের গবাক্ষমধ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি কামিনীগণের কৌতুক ও কৌতূহল সঞ্চার করিতে করিতে আমাদের এই বিচিত্র এবং বৃহৎ দলটি বাজারের সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। বাজার ছাড়াইয়াই দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতের গাত্র দিয়া প্রায় এক মাইল পথ আমরা নামিয়া গেলাম। লৌহসেতু সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী পার হইয়া পুনরায় চড়াই আরম্ভ হইল।

কাঠগুদাম হইতে আলমোরা পর্য্যন্ত পথ ভালই ছিল। কিন্তু এইবার বন্ধুর ও দুর্গম পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইল। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য পথ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। কিন্তু সেই কঠিন পার্ব্বত্য পথ কষ্টে এবং আশঙ্কায় অতিক্রম করার যে উদ্দীপনা এবং আনন্দ, তাহারও অভিজ্ঞতা ছিল না। পথ যতই দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল আমাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা ততই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে পথ বলিতে অভিধানে

যাহা বুঝায় তাহা যখন প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল তখন আমরা ডাণ্ডি হইতে নামিয়া পড়িয়া সেই অ-পথ ও বি-পথ দিয়া উৎসাহ-ভরে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। কোথাও চড়াই কোথাও নাবাই, কোথাও পিচ্ছিল কোথাও ঢালু, কোনখানে নিবিড় অরণ্য, কোন-খানে উদার উন্মুক্ত, অস্তমান সূর্য্যের কিরণবহ্নির মধ্যে তুষারশিখর তরল স্বর্ণের মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছিল; এবং আকাশের বিস্তৃত অঙ্গনে সেই স্বর্ণ-কিরণ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণাভবর্ণে পরিণত হইতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দিনের আলো মিলাইয়া গিয়া চতুর্দ্দিক অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না-কিরণে স্বপ্নরাজ্যের মত অস্পষ্ট ও মধুর হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই আমরা লম্‌গড়ের ডাকবাংলায় উপনীত হইলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অনিত্যতা

প্রভাতে ফুটিল গাছে গোলাপকুসুম
মধুর হাসিয়া,
মধ্যাহ্নের রবিতেজে দলগুলি তার
পড়ে মুরছিয়া।
সায়াহ্নে হেরিনু তারে অর্দ্ধনিমীলিত
জীবন সন্ধ্যায়,
প্রভাতে চাহিয়া দেখি শূন্যস্থান তার
কাঁদিতেছে হায়!
একটি দিনের তরে শুধু এই হাসি
সুধা বিকীরণ ?
মানবজীবন হায়, এমনি ফুরায়
পলকে কখন।

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালার সিংহাসন ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে। যদিও তখন হইতেই ইংরাজশাসন এদেশে প্রচলিত হয় নাই, তথাপি একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে ঐ সময় হইতেই ইংরাজের প্রতিপত্তি এতদ্দেশবাসীর উপর বিশেষভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে ইংরাজ বাঙ্গালায় বণিকমাত্র ছিলেন, এখন হইতে ক্রমেই রাজ্যশাসনের গুরুভার তাঁহাদের হস্তে আসিয়া পড়িল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে যে Regulating Act নির্দ্ধারিত হয়, তদ্দারাই এদেশে বৃটিশরাজ্যশাসনের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আইন দ্বারা ভারতে গভর্ণরজেনেরলের পদ ও উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহার ঠিক সাত বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে ভারতের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও আর এদেশে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। James Augustus Hicky নামক এক ইংরাজ ইহা প্রকাশিত করেন। এই হিকি বিষয়ে অধিক কিছুই জানা যায় না। 'দৈবধন' লাভার্থ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ ইতরজাতীয় ইংরাজের যে একদল সেকালে ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করিত, এই হিকিও তাহাদেরই একজন। বিলাতে অবস্থিতিকালে সে কোনও এক ছাপাখানায় কাজ করিত। গ্রাসাচ্ছাদনের অকুলান হওয়াতেই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিতে বাধ্য হয়। সেকালের ভারতকর্ত্তা ইংরাজ 'নবাবের' ঐশ্বর্য্যের চটকও ইহাকে যথেষ্ট আকর্ষণ করিয়াছিল। এই হিকি যে যথেষ্ট মৌলিক সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিম্বা ব্যবসায়বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যের সুবিধার জন্যই সেকালে এদেশে মুদ্রাঙ্কনকার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল।

এদেশে সংবাদপত্র প্রভৃতি আদৌ ছিল না। সুতরাং এমতাবস্থায় একজন সাধারণ ইংরাজ উপজীবিকার জন্য এদেশে আসিয়া যে এই নূতন জিনিস আনিয়া ফেলিবে ইহা মোটেই আশা করা যায় না। কিন্তু এই হিকি এদেশে মুদ্রাঙ্কন প্রতিষ্ঠা করিয়া সংবাদপত্র চালাইবার দুঃসাহস করিতে পারিয়াছিল। ভবিষ্যৎ যদি মানুষের দৃষ্টিগোচর হইত তাহা হইলে হিকি যে এ দুঃসাহস হইতে বিরত হইত তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই, কেননা এই কার্য্যজনিত হিকির যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা যেন আমরা অতিবড় শত্রুর জন্যও কামনা না করি।

কিন্তু হিকির প্রাণে যে লোকহিতৈষণা নিতান্ত প্রবল ছিল তাহাও নহে। এদেশে আসিয়া সকলেই কিছু ক্লাইভ, হেষ্টিংস্, ইম্পে হইতে পারে না; অথচ অভিলাষ সকলেরই থাকে। তাহারা মনে করিত যে সুযোগের অভাব এবং যাহারা উচ্চপদস্থ তাহাদের অবিচারের জন্যই এত সব ইংরাজ এই বর্ব্বরের দেশে আসিয়াও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মানবমনের এই অবস্থা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা ভুলিয়া গেলে আমরা এই হিকি প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিদের প্রতি সুবিচার করিতে সক্ষম হইব না।

হিকিরও অবস্থা ভাল ছিল না, এদেশে আসিবার পূর্ব্বেও নহে, এদেশে আসিয়াও আশানুরূপ নহে। অথচ ক্ষমতা যে তাহার অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূন ছিল একথা স্বীকার করিয়া নিজ অবস্থায় সে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিল না। বস্তুতঃ তাহার কাগজ পড়িয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে সংবাদপত্র-পরিচালন-ক্ষমতায় সেকালে তাহার ক্ষমতা নিতান্ত হেয় ছিল না। তখনকার দিনে জনসাধারণ বলিতে, হিতৈষণা বলিতে ইংরাজেরা তাহাদের নিজ দেশবাসীকেই বুঝিতেন। এই একদেশবাসী ব্যক্তিদের মধ্যে রেষারেষি দলাদলির চক্রে পড়িয়া অনেকে অযথা লাঞ্ছিত হইয়াছে, অনেক অযোগ্য ব্যক্তি উচ্চপদ লাভ করিয়াছে। হিকি জীবনে অকৃত-

কার্য্য হইয়া স্বভাবতঃই মনে করিয়াছিল যে এই চক্রান্ত তাহাকে উচ্চ হইতে দেয় নাই। সাধারণ মনুষ্যের স্থায়ই সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিল। কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর আক্রোশ না থাকিলেও সে-সময়কার উচ্চপদস্থ ইংরাজদের ভিতরে যে aristocratic clique ছিল তাহার বিরুদ্ধে সে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ভারতে নূতন ; শুধু নূতন নহে, উহা ভারতে এক নবযুগপ্রবর্ত্তক।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ২৯শে তারিখ শনিবারে হিকি তাহার কাগজ বাহির করে। উহার নাম ছিল 'The Bengal Gazette', অথবা সম্পাদকের নামে জনসাধারণে প্রচলিত ছিল Hicky's Gazette বা Journal. কাগজের গোড়াতেই সম্পাদক স্পষ্টাক্ষরে ইহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া লিখিয়াছিল, "A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none." স্কুলের Debating Clubএর Magazineএর মত ইহারও ঘোষণাস্তম্ভে কৌতুক যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তদানীন্তন অবস্থা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে হিকি নিজে নূতন কাজে ব্রতী হইয়াছিল, এদেশের প্রথা সবিশেষ জানে না, কেননা জনসাধারণের আচার ব্যবহার চিন্তা উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইবার উপায় ছিল না, অথচ ইংরাজে ইংরাজে বিদ্বেষ যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সে কাগজ ছাপিতে বিলাতী রীতি পুরা গ্রহণ করিল। বিলাতে parties আছে বহু, দলাদলিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। জ্ঞানীর ন্যায় উদার হইবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, যে আমি open to all parties. All partiesদের প্রতি সে কিরূপ উদার ছিল তাহা আমরা ক্রমে বলিব। একথা নিশ্চিত যে ব্যক্তিগত দলাদলি রেষারেষি যতই থাকুক না কেন, রাজনীতি কিম্বা ব্যবসায়গত দল এদেশে কোনও কালেই ছিল না। ব্যবসায় সম্বন্ধে আজকাল অর্থনীতিশাস্ত্র অনুসারে নানা মুনির নানা মত আছে,

কিন্তু সেকালেও ইংলণ্ড কি ইউরোপে এ বিষয়ে মতভেদ তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আর রাজনীতিতে ত কর্ত্তা বিলাতের Court of Directors; এবং এই Court of Directorsএর ভয়ে ভারতে কেহ তাহাদের কার্য্যসম্বন্ধে দ্বিতীয় মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। ইহার পরিচয় আমরা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কনবিষয়ক কড়া আইন তুলিয়া দেওয়াতে Court of Directors মেট্‌কাফ্‌কে যেরূপ বর্ব্বরোচিত ভাষায় শাসন করিয়াছিলেন তাহাতেই দেখিতে পাই।

সুতরাং এরূপস্থলে হিকির political and commercial paper open to all partiesটা নিতান্তই যে বিলাতের অনুকরণে লিখিত এবং চিন্তা না করিয়া এদেশের অবস্থার সহিত মিলাইবার প্রয়াসমাত্রের অভাবে হইয়াছিল ইহাই আমাদের ধারণা।

কলিকাতা Imperial Libraryতে এই গেজেট অদ্যাপি আছে, তবে সকল সংখ্যা পূরা নাই। বিলাতে London British Museumএ ইহার অপর এক কপি আছে, এবং উহার অবস্থাও নাকি কলিকাতার কপি অপেক্ষা অনেক ভাল। এই কাগজের ছাপা এবং কাগজ অত্যন্ত খারাপ ছিল। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেই আমরা ভাল ছাপা ও কাগজ আশা করিতে পারি না। কাগজে লিখিত প্রবন্ধাদি কখনই উচ্চ অঙ্গের হইত না, প্রায়শঃই সভ্যতাবিরুদ্ধ কটু উক্তিতে পূর্ণ থাকিত। বস্তুতঃ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন কদর্য্য গালাগালি দেওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে পারিবারিক কথা লইয়া অন্যায় আলোচনা করাই এই কাগজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তত্রাচ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্তই ইহা শান্তিতে কাটাইতে পারিয়াছিল।

এই কাগজে কি কি বিষয়ে আলোচনা হইত এবং কি প্রকারের সংবাদ থাকিত তাহা জানিলে ইহার বিচার সহজ হইবে। অতএব আমরা ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিভাগ মোটামুটি লিখিব।

Politics বিষয়ে ইহাতে সংবাদ থাকিত। Politics অর্থে যেন কেহ রাজনীতি মনে না করেন। উচ্চ চাকুরি প্রভৃতি লাভের আশায় যে সকল কৌশল অবলম্বন করা সেকালের প্রথা ছিল, তাহার নাম দেওয়া হইত Politics. অবশ্য এই সকল সংবাদ কেবল ইংরাজ সম্বন্ধেই থাকিত। বেসরকারী ইংরাজের যেসকল দুঃখ কষ্ট অসুবিধা ছিল তাহার যথেষ্ট স্থান হইত। সরকারী এবং বেসরকারী ইংরাজের লড়াইয়ে বেসরকারীর পক্ষ লইয়া এই কাগজে সরকারের দলকে বিশেষভাবেই আক্রমণ করা হইত। একদিক হইতে দেখিতে গেলে ইহা খুবই ভাল, কেন না সরকার চিরকালই সমালোচনার দ্বারা শাসিত; সমালোচনার অভাবই তাহাকে উদ্ধত, গর্ব্বী, চিন্তাহীন করিয়া তুলে। শুধু সরকারের কার্য্য কেন, যে কোনও ক্ষমতাবানের কার্য্যের উপরেই সমালোচনার কষাঘাত না থাকিলেই তাহা বিকৃত হইয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সমাজে, ধর্ম্মে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই।

'Bon Ton Intelligence' নামে সর্ব্ববিষয়ক সমালোচনা করিবার জন্য একটি বিভাগ থাকিত। ইহাতে সামাজিক ঝগড়া কেলেঙ্কারির কথাই লিখিত হইত। Society ladiesদের সৌন্দর্য্য ও চিত্তবিনোদিনী ক্ষমতা লইয়া আলোচনা হইত, কে কি রকম ভাবে লোক ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহার বিস্তারিত সমাচার সন্নিবিষ্ট হইত এবং কখনও কখনও প্রণয়ীদের বিবাহ-সম্ভাবনাবিষয়ক প্রশ্ন আলোচনা করিয়া courtshipএর গতি নির্দ্দেশ করিবার প্রয়াসও করা হইত। এক এক সময় আলোচনা সভ্যরীতিবহির্ভূত হইয়া পড়িত। যদিচ আলোচিত বিষয় বর্ণনাকালে ব্যক্তিবিশেষের নাম দেওয়া হইত না, কিম্বা কল্পিত নামই ব্যবহৃত হইত, তথাপি ঘটনা এমন করিয়া বিবৃত হইত যে, সাধারণের বুঝিতে বাকি থাকিত না যে ব্যক্তিটি কে এবং ঘটনাটি কোথায় কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। 'Trim' এই কল্পিত নামে একজন সমালোচক সেকালের

স্ত্রীজাতির পোষাক বর্ণনা করিয়া এক পদ্য লিখিয়াছিলেন। কোনও নির্দ্দিষ্ট সুন্দরী ছিল তার লক্ষ্য। কবিতার গোড়াতেই লেখা আছে, "On the present mode of dress—humbly inscribed to a certain fair damsel. সেকালের ইউরোপীয় ললনার বস্ত্রপরিধানে আচ্ছাদন অপেক্ষা নগ্নতাই অধিক প্রকটিত হইত ইহাই এই কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তদবলম্বনে কবি ব্যঙ্গচ্ছলে এইরূপ লিখিতেছেন,—

"If Eve in her innocence could not be blamed,
Because going naked she was not ashamed,
Whoe'er views the ladies, as ladies now dress,
That again they grow innocent sure will confess.
And that artfully, too, they retaliate the evil—
By the devil once tempted, they now tempt
the devil."

Miss Emma Wrangham নাম্নী সেকালের একজন সুন্দরী বিদুষীকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছিল। এবং তৎকালে পাঠকমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিয়াছিল যে ইনিই এই কবিতার উদ্দেশ্য। অসামান্য সুন্দরী এবং সর্ব্বকলাবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া এই যুবতী তৎকালে বাঙ্গালার ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। এই ইংরাজললনাকে হিকির কাগজ নানানামে নানারূপে নিগৃহীত করিত। কখনও নাম দেওয়া হইত 'Turban Conquest', কখনও 'Hooka Turban,' কখনও 'St. Helena Filly', কখনও বা 'The Chinsurah Belle or Beauty.' ইহার প্রণয়ীদেরও নানা নামে অভিহিত করা হইত। Mr. Livius নামক এক ব্যক্তিকে নাম দেওয়া হইয়াছিল 'Idea George' বা 'Titus.' কৌন্সলী Davis এর নামকরণ হইয়াছিল 'Counsellor Feeble.' Milton নামক অন্য এক ব্যর্থ-প্রণয়ীকে বলা হইত

'Jack Paradise Lost.' অপর এক রাজকর্মচারীকে 'Peegdany Durgee' বলা হইত।

Miss Wrangham সম্বন্ধে অন্যত্র এই কাগজে নিম্নলিখিতরূপে তাহার বিবাহবিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"The celebrated beauty has again, we hear, refused Idea G—. It is true there is a little disparity of age between the parties, yet there are few ladies in her situation who would have declined the offer on that account, or would have thought it could have counterbalanced a settlement of £ 20,000. The truth is Counsellor Feeble has capered her out of her senses."

অন্য এক বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'Poets' Corner.' এই পৃষ্ঠায় নব্য ইংরাজ যুবকদের মধ্যে মন্দকবিযশঃপ্রার্থীরা কাব্যালোচনা করিতেন। ইহারা যে কবিপদলাভের আশায় নিতান্তই উদ্বাহুরিববামনাঃ ছিলেন তাহা তাহাদের উপহাসাস্পদ কবিতাতেই প্রকাশ পায়। একজন তাহার প্রণয়িনী Sueকে উদ্দেশ করিয়া লিখিতেছেন,—

"O lovely Sue,
How sweet art thou,
Than sugar thou art sweeter ;
Thou dost as far
Excel sugar
As sugar does saltpetre."

এই কবিতার সঙ্গে একটি পদচিহ্নে লেখা আছে যে Scotlandএ 'thou' এই শব্দের উচ্চারণ thoo. তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে দ্বিতীয় পংক্তিতে thou, কবিতার প্রথম পংক্তিতে প্রণয়িনীর

নামের সহিত মিল রক্ষা করিতে পারিয়াছে। সুতরাং কবিতাটি সম্পূর্ণ নির্ভুল।

এবারে আমরা Hicky's Gazetteএর বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। আগামীতে ঐ কাগজ এবং উহার পরিচালক Hickyর ইতিহাস লিখিতে যত্নবান হইব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল।

স্বরূপ

মার নিত্যনব স্নেহে তোমার স্বরূপ ফোটে,
পিতার অমিয় ভাষে তোমার করুণা ছোটে,
পতিরূপে ঢাল হৃদে অনাবিল প্রেমরাশি,
শিশুরূপে শূন্য গেহে ফুটাও মধুর হাসি।
সাধকের রূপে প্রভো আছ বসে যোগাসনে,
ভক্তরূপে অবিরাম ধারা বহে দুনয়নে।
সতীরূপে ঝাঁপ দাও জ্বলন্ত চিতার মাঝে,
ভ্রাতাভগ্নী পুণ্যপ্রেমে তোমারি স্বরূপ রাজে।
নানারূপে নানাভাবে বিরাজিছ লীলাময়,
বিশ্বের পবিত্র প্রেমে তুমি যে পেয়েছ লয়।
বিশ্বেরে পৃথক করি তোমারে পাইতে চাই,
অসীম আঁধারে প্রভু আপনা হারায়ে যাই।
তোমারে নাহিকো হেরি, হেরি শুধু মরীচিকা,
পরাণে জ্বলিয়া ওঠে অশান্তির দীপ্তশিখা,

ব্যাকুল হৃদয়ে পুনঃ ধরায় ফিরাই আঁখি,
কতরূপে কতভাবে দিকে দিকে তোমা দেখি।
পতি-পুত্র ভ্রাতা-ভগ্নী পিতামাতা স্নেহছায়,
লুকাইয়া রাখিয়াছ আপন মহিমা হায়!
নহ তুমি নিরাকার, তুমি নানা আকারের,
অজ্ঞাত নহ গো তুমি, চিরজ্ঞাত মানবের।
পুলকে মিশায়ে আছ অঙ্গে অঙ্গে বসুধার,
মানব জীবন তুমি, তুমি সর্ব্বমূলাধার।
জগতে যখন তব স্বরূপ দেখিতে পাই,
তখনি চরণতলে মূরছি পড়িতে চাই।
প্রস্ফুট কুসুম পানে চাহি যবে, মনে হয়,
অঙ্গের সৌরভ তব পূর্ণ পুষ্প অঙ্গময়।
বসন্ত-মলয় বহে, পুলকে শিহরে প্রাণ,
সুরভি নিশ্বাস তব হৃদি করে অনুমান।
জলে স্থলে শূন্য মাঝে যখনি যেদিকে চাই,
বিশ্ববিমোহন রূপ কেবলি দেখিতে পাই।
নহ স্বরগের তুমি, তুমি যেগো আমাদেরি,
অন্তিমে স্বরূপ নাথ, দেখায়ো নয়ন ভরি।

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[১৩]

উড়িষ্যার জঙ্গলে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথায় গেল খুঁজিতে খুঁজিতে বাঙ্গালায় ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শেষ বলিয়া বোধ হইল, তখন উড়িষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল; যদি সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কিছু কিছু আছে এরূপ প্রত্যাশা করিবার একটা কারণ এই যে, উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। সেখানে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আর একটা কারণ এই যে, গড়জাত ও কিল্লাজাত মহলের অনেক জায়গায়—এমন কি মোগলবন্দীতেও পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। তাহাদের বিবাহাদি শুভকার্য্যে এখনও বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। সরাকি তাঁতি বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা একেবারে হিন্দু হইয়া গিয়াছে—তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে এখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের গন্ধও নাই। 'সরাকি' শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় যে উহা 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনও অনেকটা বৌদ্ধ।

মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নষ্ট হয়। উড়িষ্যাতে ত সে সময় মুসলমানেরা যাইতে পারে নাই। উড়িয়ারা আর চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় যেভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম লোপ হইয়াছিল উড়িষ্যায় সেভাবে হয় নাই। বিশেষ উড়িষ্যার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্ত্তি। এখন তিনি নারায়ণের অবতার হইলেও নবম অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি

দাস চৈতন্য-চরিত লিখিতে গিয়া জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি দিনকতক বিনা বেতনে ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিকেল্ সর্ভেয়র হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেক লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে সেখানে এখনও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অনেক স্থানে চলে। তিনি এই ধর্ম্মের অনেক উড়িয়া পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কিন্তু নগেনবাবুর সব কথা বুঝিতে হইলে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কতদিন হইতে চলিতেছিল ও ঐ ধর্ম্ম সেখানে কিরূপ গোড়া গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার কতক কতক জানা আবশ্যক। তাই আগে একটু পুরাণ কথা আলোচনা করিব, পরে নগেন্দ্রবাবুর কথা বলিব।

অশোকেরও পূর্ব্বে উড়িষ্যাদেশে বিশেষ ভুবনেশ্বরের চারিপাশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। স্পুনর (Spooner) সাহেব একবার আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া লেখা তালপাতা দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া এবং উদয়গিরির দু'একখানি লেখ পড়িয়া মনে হয় ঐর নামে একজন রাজা অশোকের অনেক পূর্ব্বে মগধের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকরাজা উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন। এখানে বলিয়া রাখি যে উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। কটক ও পুরী জেলা কলিঙ্গও বটে উড়িষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনও কলিঙ্গ বলে কি না জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গের রাজধানী ছিল তোষলি। তোষলি জায়গাটা অনেকদিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে— উহার এখনকার নাম 'ধৌলি', তোষলি শব্দেরই অপভ্রংশ। অশো-

কের তোষলি হইতে এখনকার ধৌলি এক মাইলের মধ্যে, দেখা যায়। অশোকের তোষলিতে একটি পাহাড়ের মাথা ছাঁটিয়া তথায় একটি হাতীর মূর্ত্তি বাহির করা হইয়াছে। হাতীর মাথা আছে, শুঁড় আছে, সামনের দুটি পা আছে এবং ধড়ের অর্দ্ধেকটা আছে। বাকীটা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই। হাতীর সামনে অনেকটা জায়গায় বেশ খাঁজ কাটা আছে। বেশ করিয়া নিপুণ হইয়া সে খাঁজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বে সেখানে একটি কাঠের মন্দির ছিল। হাতীটি তাহার ভিতরে থাকিত। এই মন্দিরের নীচে পাহাড়ের গা বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে অশোকের একটি শিলালেখ আছে। অশোকের অন্যান্য শিলালেখেও যতগুলি আজ্ঞা (Edict) থাকে এখানেও সেইগুলি আছে। অধিকের মধ্যে একটি নূতন আজ্ঞা আছে—সেটি এই যে শ্রাবণমাসের কোন কোন তিথিতে তোষলির লোকদিগকে এই আজ্ঞাগুলি শুনাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অশোকের সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। অশোকের পরে উড়িষ্যায় বোধ হয় জৈন-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ উদয়গিরির হাতীগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সেটি জৈনলেখ। খণ্ডগিরিতেও জৈন-ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সেখানে লোপ হয় নাই। হিয়েন-সাং যখন নালন্দায় পড়িতেছিলেন তখন উড়িষ্যার হীনযানীরা মহাযানীদিগকে কাপালিক বলিয়া গালি দিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হিয়ান-সাংকে বিচার করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাযান-ধর্ম্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসনা আরম্ভ হইল—অর্থাৎ বজ্রযান-ধর্ম্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিল—তখন উড়িষ্যা বজ্রযানের একটি প্রধান কেল্লা হইয়া দাঁড়াইল। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেন; তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, মগধ, নেপাল, তিব্বত

প্রভৃতি দেশে তাঁহার মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীঙ্করা। তিনিও বজ্রযানমতের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার তেলি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তকেরই তিব্বতী ভাষায় তর্জ্জমা আছে এবং তিব্বতী লোকে আদর করিয়া পড়ে।

ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্ব্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। ব্রাহ্মণেরও প্রতিপত্তি ছিল, বিহারবাসী ভিক্ষুদেরও প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু রাজা হিন্দু হওয়ায় এবং রাজসভায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি অধিক হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। মগধ ও বাঙ্গালার বৌদ্ধপণ্ডিতেরা লোপ হইয়া যাওয়ায় উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীন ভাবে বাস করিত। নগেন্দ্রবাবু যে সকল পুস্তক আনিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রতাপ রুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত হইয়াছিল। বড় বড় বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের মত চলিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা শূন্যপুরুষ মানিতেন। শূন্যপুরুষকেই বিষ্ণু মনে করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ কোন দাগ নাই। নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে :—

"জয় ধর্ম্ম শ্রীপুরুষোত্তম। অনাদি স্তুতি পরমব্রহ্ম॥
অব্যক্ত পুরুষ নিরাকার হরি। সর্ব্বঘটে অচ্ছু ব্রহ্মরূপ ধরি॥
নাহি রেখ রূপ তোর শ্রীবিজ্ঞ পুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হইছু প্রকাশ॥
মন নয়ন চিত্ত চেতন নাহি তোর। কর্ম্ম ধর্ম্ম সর্ব্বঠারে সিদ্ধ ন কর॥
মহামূল্য তোর নাম। ওঁকার শব্দ এ যে বেদান্ত আগম॥"

(Modern Buddhism—P 41)

আবার

"তোহর রূপ রেখ নাহি। শূন্য পুরুষ শূন্য দেহী ॥
বোইলে শূন্য তোর দেহো। আবর নাম থিব কাহিঁ ॥
শূন্য রে ব্রহ্ম সি না থাহি। সেঠারে নাম থিব রহি ॥"
(Modern Buddhism—P. 40)

শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন। যিনি শূন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম।

অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস, ও চৈতন্য দাস—ইঁহারাই এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান কবি। অচ্যুতানন্দ দাস প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস করিতেন। বলরান দাস প্রণব গীতা লেখেন এবং মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া বেদান্ত-মতে প্রণব গীতার ব্যাখ্যা করেন—তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনবরত গালি দিতে থাকে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়া বলেন, "তুই শূদ্র, প্রণব উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কি অধিকার আছে?" তাহাতে বলরাম হাসিয়া বলেন, "শ্রীপতি কাহারও নিজস্ব নন্। যে ভক্ত, যে ধার্ম্মিক, তাঁরই তিনি। জগন্নাথে কাহারও একচেটিয়া অধিকার নাই। ব্রাহ্মণেরা কেবল দাম্ভিকতা করিয়া বলিতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই। আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়া এসকল কথা প্রমাণ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া আরও রাগিয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুক্, করুক্, এখনই করুক্, এখনই করুক্।" রাজাও তাহাতে সায় দিলেন। স্থির হইল, সকলে পরদিন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে। বলরাম সেদিন ভয়ে আর বাড়ী গেলেন না—বটমূলে আশ্রয় লইলেন। গভীর নিশায় নরহরি আসিয়া বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন। পরদিন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম বলি-

লেন, "আপনি নিজে শূদ্রের মুখে বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি জড়, মূঢ়মতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আমি বেদ ব্যাখ্যা করিলে আপনি রাগত হইবেন না।" ব্রাহ্মণেরা বলিল, "ও যদি বেদ ব্যাখ্যা করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিব"। বলরাম বলিলেন, "তবে শুনুন। নিত্য হইতে শূন্যের উৎপত্তি; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপত্তি; প্রণব হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি; বেদ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।" এই কথা শুনিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবার প্রতাপরুদ্র রাজার বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধপণ্ডিতদিগকে আনাইয়া চুরির ঠিকানা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা পারিল না, বৌদ্ধেরা পারিল। সুতরাং রাজা বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু রাণী তাহাতে ভারি চটিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড় আবার পরীক্ষা হইল। একটা মুখঢাকা হাঁড়ী সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়ীতে কি আছে? তাহার ভিতরে ছিল সাপ। ব্রাহ্মণেরা বলিল, 'মাটি আছে'। ঢাকা খুলিলে মাটিই দেখা গেল। ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন—কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান লামা তারানাথ এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম্ম নামে এক নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্ম্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মেও ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। এ ধর্ম্মের প্রধান গুরু ভীমভোই—ইঁহার পূরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস। ধেকানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি নীচ কন্ধ জাতিতে ইঁহার জন্ম। ইনি ধান ভানিয়া খাইতেন। কিন্তু ভগবানের প্রতি ইহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইনি মনের দুঃখে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগে থাকেন। একদিন যাইতে যাইতে তিনি এক কূয়ার মধ্যে পড়িয়া যান। কূয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নিকটের লোকে তাঁহাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি উঠিতে চাহিলেন না। তিনদিনের দিন রাত্রিশেষে ভগবান্ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া কূয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতে লাগিলেন। "ভীম তুমি উপর দিকে চাহ—দেখ আমি আসিয়াছি।" ভীম অন্ধ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ভগবান্‌কে দেখিলেন। ভগবানও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কূয়া হইতে উঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যাও, অলেখ ধর্ম্ম প্রচার কর।" ভগবান্ তাঁহাকে একখানি কৌপীন দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর কোন জিনিষ ভিক্ষা করিও না, গ্রহণও করিও না।" কৌপীন পরিয়া ভীমভোই যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "একটা পেটের মত চারটিখানি ভাত দাও," তখন গাঁয়ের লোকে সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন ভাত ছাড়া আর কিছু লইবেন না জানিল, তখন "এ লোকটা আমাদের জাত খাইতে আসিয়াছে" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার

করিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনিও কৌপীন ফেলিয়া কপিলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদুর গেলে শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হইয়া বলিলেন, "তোমার এখনও সিদ্ধি হয় নাই। নহিলে তুমি মার খাইয়া পলাইয়া আসিবে কেন?" এই বলিয়া তিনি ভীম্‌ভোইর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে একটা মন্দিরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সে মন্দিরের অন্ধি সন্ধি সব বুজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি বাহিরে বসিয়া তিন বার হাততালি দিব, তোমার যদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ত, তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।" তিন তালির পর ভীম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ভগবান্ বলিলেন, "ভীম তোমার সিদ্ধি হইয়াছে। তুমি জুরন্দাতেই থাক। তোমায় আর কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি এখানে বসিয়াই অলেখ ধর্ম্মের কবিতা লেখ।" ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার সন্তানাদিও হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 'কলি ভাগবত'। তাঁহার বহুতর ভজন ও পদাবলী আছে। দশ বার বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভীমভোই একবার সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। যশোমতী মালিকা নামক গ্রন্থে এই ধর্ম্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে যে গৃহত্যাগ করিবে সে,—

স্বজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥
দারা সুত বিত্ত ব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি।
কুম্ভিপট পিন্ধি শিরে থিবে জটা ধরি॥

জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ ম বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরু পাই আনন্দ লভিবে॥
অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা।
নব শূদ্র ঘরে মাগি খেলু থিবে ভিক্ষা॥
তেলি, তন্ত্রী, ভাট, কেরা, রজক, কুলারক।
ব্রহ্ম, ক্ষেত্রী, চণ্ডাল যে আবুরিলা পিক॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে।
অশুদ্ধ এ মানে শাস্ত্রে লিখিয়াছি পূর্ব্বে॥
এ মানে অটন্তি অধা জন্তুরু জাতকি।
তেনু করি নব শূদ্রে বাছি রখিছন্তি॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দাস।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লগাই দোষ॥
মহাব্রহ্ম তেজরে জে হই যাই ভস্ম।
শূদ্রঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্কু দুষ্য॥
নব শূদ্রঘরে অন্নভিক্ষাকু ভুঞ্জিবে।
নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে॥
দিবসরে নিদ্রাকালে কাল করে বাস।
রাত্রে অন্ন ভোজন আহারে হয় দোষ॥
প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জিকে।
রাত্রে উপবাস যমকালুকু জগিবে॥
নিশি উজাগরে রহি ধুনিকি জগিবু।
পঞ্চিশ প্রকৃতি তেবে পাঁস করিবু॥
জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে।
একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদরে॥

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বিনয়পিটকের নিয়মের সহিত এই সকল নিয়মের অনেক মিল আছে। ভেকধারী বৈষ্ণবরা এসকল নিয়ম পালন করে না। বিশেষতঃ বৈষ্ণবেরা নীচজাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচজাতির

অন্ন মহিমা-ধর্ম্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুম্ভ নামক গাছের বাকল পরে, সেইজন্য ইহাদিগকে কুম্ভপটিয়া বলে।

ইহাদের মতে বুদ্ধদের অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব নীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন।" বুদ্ধদেব বলেন, 'আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু। বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে থাকিতে বলেন। তিনিও বার বৎসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া অন্তর্দ্ধান হন।

ভীমভোই বুদ্ধস্বামীর উদ্দেশে এই গানটি লিখিয়াছিলেন,—

অনাকার অরূপ ব্রহ্ম মুরতি হে
এবে বীজে করিছন্তি ধরিতী হে।
অরূপ পুরুষ রূপবন্ত হইলে
ব্রহ্মাণ্ডকু আইলে,
ভকত হিতকারী করুণা-কৃপাধারী
মায়াসিন্ধু সাগরু এবে উধার করি
কিন্তু প্রাণকু দেই কর ভকতি হে॥১॥
অগমিকা পুরুষ নামকু বহি
ব্রহ্মা নিমন্তে মহি
নির্ব্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস
ভজি বেবে পারিব জীব পূর্ব্ব কল্মষ
তেবে পাইব সদগতি মুকতি হে॥২॥
অচিহ্ন পুরুষ সে যে চিহ্নিবা দেলে
আপে অভিথি হেলে

অলেখ পদ যেহু লেখিন হোই সেহু
গুণপগে শকতা অটন্তি মহাবাহু
একুইশ ভবনে সেহু নৃপতি হে ॥৩॥
অকল্পন পুরুষ সে কল্পন কলে
অঙ্গু সর্ব্বে জন মিলে
আজ সে করতাঙ্কু নেত্র রে দেখু দেখু
নিন্দিত করু অচ্ছ ভজু অচ্ছ কাহাকু
এবে মহিমা ধর্ম্ম অচ্ছি নিরিখি হে ॥ ৪ ॥
অক্ষয় পুরুষ ক্ষয় হেবাকু নাহি
একুনহি দুই ব্রহ্মাণ্ডে গুরুবাজে
শিষ্য নাহান্তি কেহি
বঢ়হি মা পনে সর্ব্বে দিন যাউছি হি
গুরুদর্শনে খণ্ডকাল বিপতি হে ॥ ৫ ॥
দেহধারী হইছন্তি মহীমণ্ডলে
এ ঘোর কলিকালে
এবনা একাক্ষর বানাহি বীরবর
বচন সুধাধার মুক্তিদানী পয়র
ভণে ভীম অরক্ষিত করি বিনতি হে ॥ ৬ ॥

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[১২]

(ফাল্গুনের নারায়ণের ৪৩২ পৃষ্ঠার ক্রমানুবৃত্তি)

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (৭)

পরা-প্রকৃতি ও অপরা-প্রকৃতি ।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে যে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে স্বভাব অর্থে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না; করিলে তার অর্থের সঙ্গতি রক্ষা অসাধ্য হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে অবতার-প্রসঙ্গে যে প্রকৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাকেও স্বভাব অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব। এই প্রকৃতি তবে কি ?

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ তাঁর দ্বিবিধ প্রকৃতির কথা কহিয়াছেন, এক পরা, অন্য অপরা।

> ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ভূমি বা পৃথিবী, আপ বা জল, অনল বা তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, আর অহঙ্কার,—এসকল আমার অষ্টপ্রকারের পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি। এগুলি আমার অপরা প্রকৃতি। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ—আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু বিষয় গ্রহণ করি, এই পাঁচটি তার মূল উপাদান। আর আমাদের প্রাচীন মনস্তত্ত্বে এই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশ্লেষণ করিয়া, সমগ্র বিষয়-রাজ্যের মূলে ও অন্তরালে ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোম—অর্থাৎ ভূমি, আপ, অনল, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আর এখানে ভূমিরাদি বলিতে প্রাচীনেরা পঞ্চ তন্মাত্রা বুঝিতেন। ভূমি—গন্ধ-তন্মাত্রা, আপ—রসতন্মাত্রা, অনল—রূপতন্মাত্রা, বায়ু—স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ—শব্দতন্মাত্রা। এই পঞ্চ তন্মাত্রাই যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বিষয়ের মূল উপাদান। এই পঞ্চ তন্মাত্রার সাহায্যেই আমরা জগ-তের ভূতগ্রামের যা-কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। আবার এই সকল রূপ-রসাদির সাহায্যেই আমরা এই ভূতগ্রামকে সম্ভোগও করি। অর্থাৎ এই পঞ্চতন্মাত্রাই এই প্রত্যক্ষ বিষয়রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের ও ভোগের উপায় ও উপকরণ হইয়া আছে। এই রূপরসাদিই আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্য। এসকল ছাড়া এই জড়-জগতের বা জীবজগতের আমরা আর কিছুই জানি না ও ভোগ করিতে পারি না। আর আমাদের জ্ঞানের ও ভোগের সেতু বলি-য়াই এই পঞ্চতন্মাত্রা একদিকে আমাদের বাহিরে এই প্রত্যক্ষ বিষয়রাজ্যকে ও অন্যদিকে আমাদের ভিতরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধিকার করিয়া, ছাইয়া আছে। এসকল তন্মাত্রা বাহিরের বিষয় চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়সকলকে ছাড়াইয়া, আমাদের অন্তরিন্দ্রিয় মনকে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া আছে। মন পর্য্যন্ত আপনার মননক্রিয়ার জন্য এসকলের অপেক্ষা রাখে। আবার রূপরসাদিও মনের অপেক্ষা রাখে। রূপ-রসাদি পঞ্চতন্মাত্রা, চক্ষুরাদি পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়, আর অন্তরিন্দ্রিয় মন, ইহারা সকলে একে অন্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। এসকলের কেহই স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। ফলতঃ পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন, ইহারা পৃথকভাবে কিম্বা সকলে মিলিয়াও আমাদিগকে কোনও বিষয়ের জ্ঞান বা ভোগ দান করিতে পারে না। রূপরসাদি যেমন চক্ষুরাদির অপেক্ষা রাখে, চক্ষুরাদি যেমন মনের অপেক্ষা রাখে, মন সেইরূপ বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকে। চক্ষু কেবল রূপ দেখে; আর এই রূপও চঞ্চল প্রবাহের মতন চক্ষুকে স্পর্শ করিয়া, গোলকদর্পণে ক্ষণিক কম্পিত হইয়া, নিমেষের মধ্যে সরিয়া পড়ে। চক্ষুর এমন কোনও শক্তি নাই যাহার দ্বারা সে এই বিদ্যুচ্চঞ্চল রূপপ্রবাহকে ধরিয়া রাখিয়া একটা গোটা রূপের বা সম্পূর্ণ রূপবান বস্তুর কোনও জ্ঞানদান করিতে পারে। কোনও

ইন্দ্রিয়েরই এই গোটাবস্তুর জ্ঞানদান করিবার সামর্থ্য নাই, কেহই রূপরসাদির বিদ্যুচ্চঞ্চল প্রবাহকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যে মন, তাহারও এই শক্তি নাই। এই ধারণা-শক্তি আছে কেবল বুদ্ধির। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল ক্ষণিক কম্পায়মান খণ্ড খণ্ড অনুভূতি মাত্র জন্মায়। ফলতঃ আমাদের ভাষায় ইহাকে অনুভূতিও বলে না। যাহার দ্বারা সমগ্র জ্ঞান প্রকাশিত হয়, আমরা তাহাকেই অনুভূতি বলি। এখানে ইংরাজি sensation'এর ও perception'এর প্রতিশব্দ রূপেই অনুভূতি শব্দ ব্যবহার করিলাম। মন এই সকল খণ্ড খণ্ড অনুভূতির মধ্যে ভেদাভেদ-প্রতিষ্ঠা করে। "হাঁ" আর "না" মন এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়া আপনার যাবতীয় মননক্রিয়া সম্পাদন করে। বহিরিন্দ্রিয়সকল যেমন আমাদিগকে বিষয়ের গোটা জ্ঞানদান করিতে পারে না, সেইরূপ এই অন্তরিন্দ্রিয় মনও এসকল খণ্ডজ্ঞানের সমীকরণ ও একীকরণ যেখানে হয়, সেই বিজ্ঞানের ভূমিতে লইয়া যাইতে পারে না। মন কেবল ভাগবাটোয়ারাই করে, একত্বস্থাপন করিতে পারে না। মনের উপরে এইজন্য বুদ্ধি। এই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সকলের খণ্ড খণ্ড অনুভূতি ও মনের ভাগবাটোয়ারার উপরে জ্ঞানের একত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই একত্বও পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করে না। ইন্দ্রিয় যেমন মনের অধীন, মন যেমন বুদ্ধির অধীন, বুদ্ধি সেইরূপ অহঙ্কারের অধীন। আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয়, আমার বিষয়, এই অহঙ্কারের দ্বারাই আমরা যাবতীয় জ্ঞেয় ও জ্ঞানের উপরে নিজেদের অখণ্ড স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের নিজেদের এক একটা গোটা বিষয়-রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া থাকি। ইংরাজি দর্শনের পরিভাষায় এই অহঙ্কারকেই বোধ হয় empirical ego বলিতে পারা যায়। এই অহঙ্কারের উপরেই ব্যক্তিত্বের বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা individualism'এর প্রতিষ্ঠা হয়। মন বিষয়-রাজ্যে ভেদবিরোধ প্রতিষ্ঠিত করে। এই অহঙ্কার বিষয়ীর রাজ্যে স্বাতন্ত্র্যের ও ভাগাভাগির প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। প্রাকৃত

মানুষের মধ্যে আমরা এই অহঙ্কার পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আর অহঙ্কার এসকল সাধারণ প্রাণী-ধর্ম্ম। যাহাদিগকে আমরা ইতর জন্তু বলি, তাহাদের মধ্যেও এসকল আছে। এক পক্ষী আপনাকে অন্য পক্ষী হইতে পৃথক্ ভাবে। আরও নিম্নে, মৎস্যেরা একে অন্যকে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া জানে। কীট পতঙ্গাদির মধ্যেও এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা পরিচ্ছিন্নতাবোধ, এই আমি, আমি অভিমান, আছে। যতই অপরিস্ফুট আকারে হউক না কেন, প্রাণীমাত্রেই ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-ধর্ম্ম রহিয়াছে। ভূমিরাপোনল প্রভৃতি যেমন যাবতীয় জ্ঞেয় ও ভোগ্যের উপাদান, সেইরূপ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার যাবতীয় জ্ঞাতা ও ভোক্তার ধর্ম্ম। স্থূল ভূতগ্রাম হইতে, মানুষ পর্য্যন্ত, সকলের মধ্যে এই আটটি বস্তু বা তত্ত্ব দেখিতে পাই।

এই সকল তত্ত্ব পরিণামী। ইহারা উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মী। এ সকল অপ্রত্যক্ষ ভূমি হইতে প্রত্যক্ষীগোচর হয়; আবার অপ্রত্যক্ষ হইয়াও যায়। উপনিষদ যাহাকে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার মূল বলিয়া—"যতো বা ইমানিভূতানি জায়ন্তে"—এই শ্রুতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই আট প্রকারের প্রকৃতিই সেই ভূতগ্রাম—সেই "ইমানি ভূতানি।" বেদান্ত—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—সূত্রে, এই আট প্রকারের প্রকৃতিকেই "অস্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও এতদুভয়ে আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা যে পঞ্চ তন্মাত্রা, গীতা এখানে তাঁহাকেই "ভূমিরাপোনলোবায়ুঃ খং,"—বলিয়াছেন। কেবল এইগুলিরই যে উৎপত্তি ও বিলয় হয় এমন নহে। এগুলি একদিন ছিল না, কালে উৎপন্ন হইল; এই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মনও একদিন ছিল না, কালে উৎপন্ন হইল, ইহাও বলিতে হয়। কারণ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি ধর্ম্ম ব্যতীত মনের ক্রিয়া ত সম্ভব হয় না। সমাধিতে, যোগীজনেরা বলেন, বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্য যখন একান্ত বন্ধ হইয়া যায়, তখন মনের কার্য্যও লোপ প্রাপ্ত হয়। মন যেমন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মশীল ও প্রকাশিত হয়,

বুদ্ধিও সেইরূপ মনের আশ্রয়েই ফুটিয়া উঠে। আর আমাদের এই অহঙ্কার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ বা ব্যষ্টি-অভিমান বা individuality'ও বুদ্ধির আশ্রয়েই, বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জন্মিয়া থাকে। আর জন্ম অর্থই যাহা জ্ঞানের ভূমির বাহিরে ছিল, তাহা জ্ঞানেতে প্রকাশিত হইল; যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইল। স্থূল ভূতগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া এই অহঙ্কার পর্য্যন্ত, এই জন্যই জন্ম-স্থিতি-লয় ধর্ম্মের অধীন। পঞ্চ স্থূলভূত হইতে এই অহঙ্কার পর্য্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইহারা সকলে একে অন্যের অপেক্ষা রাখে, একে অন্যের আশ্রয়ে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া একে অন্যের আশ্রয়ে বাস করে। ইহাদের একটির একান্ত বিলোপে অপর সকলে বিলুপ্ত হয়। একটির প্রকাশে অপর সকলে প্রকাশিত হইয়া উঠে। এই গীতোক্ত "অষ্টধা প্রকৃতি"কেই উপনিষদ "ইমানি ভূতানি" বলিয়াছেন। ভূমি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত জন্মমরণশীল, পরিবর্ত্তনাধীন, পরিণামধর্ম্মী। আর এ সকল নিত্য নহে বলিয়াই ভগবান্ গীতায় এগুলিকে তাঁর প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করিয়াও, অপরা বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন।

অপবেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিংপরাং
জীবভূত মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।

অর্থাৎ—হে মহাবাহো। এইগুলি (ভূমিরাপোনলবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেবচ, অহঙ্কার ইতীযং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধাঃ) আমার অপরা প্রকৃতি। আমার আর এক পরা প্রকৃতি আছে। সে প্রকৃতি জীব-প্রকৃতি। তাহারই দ্বারা আমি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছি।

এই জীব কে? কিরূপেই বা ইহা ভগবানের পরাপ্রকৃতি হইল? আর কিরূপেই বা এই জীব এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে? বারান্তরে এই সকল জটিল ও গভীর প্রশ্নের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নারায়ণ

২য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা]   [বৈশাখ, ১৩২৩ সাল

"তদুচিত গৌরচন্দ্র"

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনেই বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী রচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে এসকল পদাবলী গান করিতে হইলে, সকলের আগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা-বিষয়ক দু'একটি পদ গাহিতে হয়। এই পদগুলিকেই তদুচিত গৌরচন্দ্র কহে। তৎ—অর্থাৎ যে বিশেষ পালা গাহিতে হইবে তার, উচিত—অর্থাৎ উপযোগী, আর গৌরচন্দ্র—অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলা-বর্ণন,—ইহাই এই "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" সোজা অর্থ। কিন্তু ইহার মর্ম্ম কি ?

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। ৺জয়দেব গোস্বামী মহাপ্রভুর প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বকার লোক। তাঁর ললিত পদাবলী প্রথম হইতেই গীত হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসও মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী। মহাপ্রভু স্বয়ং ইঁহাদের পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, এবং এসকল পদ অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলারস আস্বাদন করিতেন।

তবে মহাপ্রভু এসকল লীলাকীর্ত্তনের যে নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করেন, তাঁর পূর্ব্বে তাহা ততটা প্রকাশ পাইয়াছিল কি না, সন্দেহ। এসকল রসকীর্ত্তন রাগানুগা সাধনের সহায় ও অবলম্বন। আর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই রাগবর্ত্মের সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিচয় পাওয়া যায়। গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের মিলন হইলে যে নিগূঢ় কথোপকথন হয়, তাহা হইতেও এই সাধন অপ্রচলিত হইলেও যে একান্ত অর্ব্বাচীন নহে, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এই রাগবর্ত্মটি তখন পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ সাধকেরা নিগূঢ় ভাবে, নিজ নিজ অন্তরঙ্গ সাধনেই, অবলম্বন করিতেন, লোক-সমাজে তাহা অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল। এই রাগবর্ত্মটি বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও বৈষ্ণব সাধনের esoteric বস্তু ছিল, লোকসমাজে প্রকাশ পায় নাই। মহাপ্রভু এই নিগূঢ় সাধনটিকে শুদ্ধা ভক্তির প্রকাশ্য রাজপথে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শুদ্ধা, রাগানুগা ভক্তিটিই তিনি "আপনি আচরিয়া" জগতকে দেখাইয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন। এই-টিই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত ভক্তির বিশেষত্ব।

নাম-যজ্ঞ ও সংকীর্ত্তন।

প্রাচীনকালে বহুবিধ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত। ক্রমে সে-সকল লোপ পাইয়া, নানাপ্রকারের ক্রিয়া-কলাপ ও প্রতীকোপাসনাদি প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপ্রভু এসকলকে "বাহ্য" বলিয়া উপেক্ষা করিয়া, নাম-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিলেন। "নামে রুচি, জীবে দয়া"—ইহাই তাঁর ধর্ম্মের বুনিয়াদ হইল।

> হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্।
> কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
> হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম সার।
> কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর॥—

মহাপ্রভু ইহা প্রচার করিলেন। কলির একমাত্র যজ্ঞ এই নাম-

যজ্ঞ। ভগবানের নামগান ও লীলাকীর্ত্তন উভয়ই এই নামযজ্ঞের অঙ্গ। ভক্ত বৈষ্ণবেরা নাম-কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তনও করেন। এই ভাবে দিনের পর দিন, ধারাবাহিক রূপে, রাধাকৃষ্ণের লীলা-গান হয়। এরূপ কীর্ত্তন-যজ্ঞের "অধিবাস" হইয়া থাকে। সংকীর্ত্তনের অধিবাসের একটি বিশেষ পালা আছে। এইটি মহাপ্রভুর লীলার অন্তর্গত। এই অধিবাসের পালার সব গানই মহাপ্রভু সম্বন্ধে, সুতরাং এই অধিবাসের পালাতে আর বিশেষ করিয়া "তদুচিত গৌরচন্দ্র" গাহিতে হয় না। এটি নিজেই যে গৌরচন্দ্র। তবে কেবল সাধারণ মঙ্গলাচরণ স্বরূপ— "জয় রে! জয় রে! গোরা, শ্রীশচীনন্দন মঙ্গল নটন সুঠাম" এই গানটি "অধিবাসের" পালার প্রথমে গীত হইয়া থাকে। কি করিয়া প্রথমে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনোৎসব প্রতিষ্ঠা করেন, এই "অধিবাসের" পালাতে তারই বর্ণনা আছে। সে কাহিনীটি এই :—

একদিন পহু আসি, অদ্বৈত মন্দিরে বসি,
বলিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি, সীতাঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দ মনে, মহোৎসবের বিধানে,
বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যেবা গায়, যে বাজায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরা রায়, আজ্ঞা দিলা সবাকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।

খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণঘট করহ স্থাপনে ॥

কি ভাবে যে বৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ হইল, "চৈতন্য ভাগবত"-প্রণেতা বৃন্দাবনদাস তার বর্ণনা করিয়াছেন :—

নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের বলে, বৈষ্ণব আসিয়া মেলে
কালি হবে মহোৎসব বিলাস।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ ॥

এইরূপে মহাপ্রভু নিজে আপনার ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানই আস্বাদন করিতেন। তাঁর সমসময়ে বাঙ্গালার কৃষ্ণকীর্ত্তনীয়াগণ "তদুচিত গৌরচন্দ্র" বলিয়া যে কোনও পদ গাহিয়া কীর্ত্তনের ভূমিকা বা অবতারণা করিতেন না, ইহা না বলিলেও চলে। এই "তদুচিত গৌরচন্দ্র"গুলি মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাগানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে। তবে কত পরে, ইহা বলা সহজ নহে।

"গৌরচন্দ্র" ও "গৌরাঙ্গ-অবতার"।

এই "তদুচিত গৌরচন্দ্র"গুলি রচিত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে অবতারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই "গৌরচন্দ্র"গুলির অধিকাংশই তাহার আশ্রয়ে রচিত। আর মহাপ্রভুর তিরোভাবের পূর্ব্বে কিম্বা তার অব্যবহিত পরেই এই অবতারতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। নবদ্বীপেই তাঁর অলৌকিক শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নীলাচলে তাঁর এই

শক্তি অনর্পিতচরী ভক্তি-মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। এসকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি যে সামান্য মানুষ নহেন, এ ধারণা অনেকেরই মনে জন্মিয়াছিল। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহাকে আপনাদের প্রাণের গভীরতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রেমভক্তি দান করিতেন, ইহাও সত্য। কেহ কেহ হয় ত বা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়াই মনে করিতেন, ইহাও সম্ভব। নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাড়ীতে ও নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দিরে তাঁর অপূর্ব্ব ভাবাবেশ দেখিয়া কাহারও কাহারও মনে তিনি আপনি নারায়ণ, এ ধারণাও জন্মিয়া থাকিতে পারে। তাঁর তিরোভাবের পূর্ব্বেই ভক্তমণ্ডলীর মনে এসকল ভাব শনৈঃ শনৈঃ সঞ্চিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। কারণ, তাহা না হইলে, ইহার অত্যল্পদিন পরেই তাঁর অবতারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত না। কিন্তু তাঁর আবির্ভাব সময়েই ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার বলিয়া ভাবিলে বা ভজিলেও, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে অবতার-তত্ত্বটি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখনও তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, একথা সহজেই বলা যাইতে পারে।

খৃষ্টীয়ান্ ও বৈষ্ণব অবতারবাদ।

খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে ঈশ্বরাবতার বলিতে যাহা বুঝায়, হিন্দুধর্ম্মে ঠিক তাহা বুঝায় না। খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে এক যীশুখৃষ্টই একমাত্র ঈশ্বরাবতার। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মে অবতারের ইয়ত্তা নাই। ভাগবত বলিতেছেন—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনির্ধেির্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

হে দ্বিজগণ! যেমন কোনও অক্ষয় জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণের আশ্রয় যে শ্রীহরি তাঁহা হইতে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

পরম তেজোসম্পন্ন ঋষিগণ, মনুগণ, দেবগণ ও মনুপুত্রগণ ও প্রজাপতিগণ, সকলেই হরির অংশ বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদের সকলকেই অবতার বলা যায়। হিন্দু এই ভাবেই অবতার-বস্তুটিকে দেখিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোনও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধক বা সিদ্ধ মহাপুরুষকে অবতার বলিয়া ভাবিতে বা অবতাররূপে গ্রহণ করিতে হিন্দুর একটুও আটকায় না। আজিও এদেশে কোনও অসাধারণ-সাধনসম্পদসম্পন্ন মহাপুরুষকে দেখিলেই লোকে অকুণ্ঠা-সহকারে, সরল ও সহজ বিশ্বাসভরে, অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। মহাপ্রভুকে তাঁর আবির্ভাবকালেই অনেকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে।

গীতা-ভাগবতের অবতারতত্ত্ব ও চৈতন্যাবতারতত্ত্ব।

কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে অবতার-তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ভগবদ্গীতার বা শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার-তত্ত্ব হইতে এই তত্ত্বটি ভিন্ন। ভগবদ্গীতা যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, আর দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। আর যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবানের এইরূপ অবতার হইবার "যুগ" উপস্থিত হয়। এই যুগাবতারের কথাই গীতায় কহিয়াছেন। ভাগবতে এ ছাড়া লীলাবতারের কথাও আছে। যুগাবতার হয়, জগতের হিতের জন্য। লীলাবতার হয়, ভগবানের নিজের তৃপ্তির জন্য। প্রথমটির প্রয়োজন বাহিরের, লোক-সৃষ্টি ও লোক-রক্ষা। দ্বিতীয়টির প্রয়োজন ভিতরের, আত্মতৃপ্তি ও আত্মরমণ; আপনাকে

আপনি আস্বাদন ও আপনার সঙ্গে আপনি রমণ করিবার জন্য। দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের যে অবতার হইয়াছিল, তাহার প্রয়োজন লোকরক্ষা নহে, কিন্তু লীলা-প্রকাশ। এই কৃষ্ণ-লীলার কথাও ভাগবত গান করিয়াছেন।

প্রাচীন অবতার-তত্ত্ব এই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। আর মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই প্রাচীন ভাবে ও প্রাচীন আদর্শেই তাঁহাকে ভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে অবতার-তত্ত্বটি অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখনও তাহা ভাল করিয়া প্রকাশিত হয় নাই। হয় ত কেহ কেহ এ আভাস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে আভাসে আর এই প্রকাশে বিস্তর প্রভেদ। ফলতঃ এ আভাসও কতটা ফুটিয়াছিল, ইহাও বলা অত্যন্ত কঠিন। এ সম্বন্ধে সমসাময়িক কোনও অকাট্য প্রমাণ আছে কি না, সন্দেহ। অন্যত্রও দেখিতে পাই, কোনও মহাপুরুষের জীবদ্দশায় এসকল অতিলৌকিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। তাঁহাদের তিরোভাবের পরেই, লোকে তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া, এসকল তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে যে তাহা হয় নাই, ইহাই বা কেমন করিয়া বলিব?

কিন্তু যখনই মহাপ্রভুর অবতার ভক্তগণের অন্তরে প্রকাশিত হউক না কেন, কবিরাজগোস্বামী ইহার যে নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সেটি অতি অপূর্ব্ব ও অত্যন্ত মধুর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে দুই দিক্ দিয়া অবতারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; এক জ্ঞানের দিক্ দিয়া, আর এক ধর্ম্মের বা নীতির দিক্ দিয়া। এই জগতের উৎপত্তি ও বিকাশের তথ্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়া ভাগবত এক অবতারবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান মহদাদিভিঃ
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥

"ভগবান লোকসৃষ্টিকামনায় প্রথমে মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্রা, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত, এই সকলের যোগে পৌরুষ বা বিরাট পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করেন।" এই বিরাট পৌরুষরূপ হইতেই সৃষ্টিধারাতে নানা অবতারের প্রকাশ হয়। এইরূপেই বরাহ, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের প্রকাশ হইয়াছে। এই বিকাশধারাতেই ক্রমে সেই বিরাট-পুরুষ "নরদেবত্বমাপন্নঃ"—নরদেবত্ব-প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হন। এই ধারাতেই, বিরাট পুরুষ জনসমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন। ভাগবত এই ভাবেই জ্ঞানের দিক্ দিয়া, অর্থাৎ এই লোকসৃষ্টির মূল ও ক্রম অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, এবং ধর্ম্মের দিক্ দিয়া, অর্থাৎ লোকস্থিতি-ভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত, সমাজের উন্নতি বিধানার্থে, ভগবানের বহুবিধ অবতারের কথা কহিয়াছেন। ইহা ছাড়া রসের দিক দিয়া বিশ্ব-সমস্যা ভেদ করিতে যাইয়া, ভাগবত লীলাবতারের কথাও কহিয়াছেন। কবিরাজগোস্বামী মহাশয় এই নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের আশ্রয়েই শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারের এই অতি অপূর্ব্ব ও অত্যন্ত মধুর তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতের লীলাবতারেতে যে বস্তুটি অর্দ্ধেক ফুটিয়াছিল, এখানে সেটি পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যদুনন্দন ও নন্দ-নন্দন।

ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা কহিয়া, ভাগবত বলিলেন—এই যে সনৎকুমার হইতে আরম্ভ করিয়া কল্কি পর্য্যন্ত যত বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবতারের নাম করিলাম, আর এসকল ছাড়াও মহাতেজ-সম্পন্ন অসংখ্য ঋষি, মনু, দেবতা, মনুপুত্র ও প্রজাপতিকে ভগবানের অবতার বলিয়া কহিলাম, ইহারা বিরাট পুরুষের অংশ ও কলা মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ আপনি পূর্ণ ভগবান।

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

এই শ্রীকৃষ্ণ কে? বৃষ্ণিবংশজাত যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত পূর্ব্বেই "অবতার"-মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরং ॥

উনবিংশে ও বিংশে ভগবান বৃষ্ণিবংশে রাম আর কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করেন। আর "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ"—এসকল পুরুষের অংশ ও কলা,—এই এতে'র বা এসকলের মধ্যে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত ধরিয়া পরে বলিলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। সুতরাং যে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত বলিয়াছেন, যিনি "এতে'র মধ্যে পড়িয়াছেন, "স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ" হইতে ভাগবত আপনি তাঁহাকে পৃথক্ করিয়াছেন। অর্থাৎ—ভাগবত বৃন্দাবনলীলার বর্ণনাতে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা কহিয়াছেন, তিনিই "স্বয়ং ভগবান।" তিনিই অবতারী। এই সূত্র ধরিয়াই পরে লঘুভাগবতামৃত কহিয়াছেন—"পরমতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি এক, আর যদুসম্ভূত যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি অন্য। এই যে পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোথাও যান না।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কশ্চিৎ নৈব গচ্ছতি।

এই জন্যই এই বৃন্দাবনলীলা নিত্যলীলা। ইহা নিত্য বলিয়াই সৃষ্টি-ধারার অতীত, ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত বস্তু।

ভগবৎ-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ বস্তু।

ভগবানের এই স্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইহা সৎ, অর্থাৎ আপনি আপনার সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত; ইহা চিৎ ও আনন্দ। চিৎ অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান বলিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ও তদুভয়ের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা বুঝায়। জ্ঞেয় নাই, অথচ জ্ঞাতা আছে, ইহা হইতেই পারে না। ইহা মাথা নাই যার তার মাথা-ব্যথার মতন অবস্তু, মিথ্যা। আর জ্ঞাতাও আছে, জ্ঞেয়ও আছে, কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নাই, ইহাতেও জ্ঞান সম্ভব হয় না। আর সম্বন্ধ যেখানে সেখানেই ভেদ

ও অভেদ দুই আছে। ভেদের ভিতর দিয়াই সেখানে অভেদ, আর অভেদের ভিতর দিয়াই ভেদের প্রতিষ্ঠা হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যদি অভেদ হয়, তবে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার উভয়ের মধ্যে যদি একান্ত ভেদ থাকে, অর্থাৎ যাহা জ্ঞাতাতে নাই তাহাই যদি জ্ঞেয় ও যাহা জ্ঞেয়েতে নাই তাহাই যদি জ্ঞাতা বলা যায়, তাহা হইলেও জ্ঞানের সম্বন্ধের কোনও ভূমি গড়িয়া উঠে না। জ্ঞান তাহাতে অসাধ্য হয়। জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর ভেদের মধ্যে অভেদের ও অভেদের মধ্যে ভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াই সকল জ্ঞান প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আনন্দেও ভোক্তা এবং ভোগ্যের সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দের প্রয়োজনে ভোক্তা ও ভোগ্যের এবং এতদু-ভয়ের মধ্যে সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়। এই সম্বন্ধেতেও ঐ ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এখানেও ভোক্তা ও ভোগ্যের মৌলিক অভেদের মধ্যে আকস্মিক ভেদ ও এই আকস্মিক ভেদকে বিনাশ করিয়া আবার সেই মৌলিক অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর দিয়াই আনন্দ প্রকাশিত ও পরিপূর্ণ হয়।

লীলা-তত্ত্ব।

এই দেওয়া-নেওয়া, এই ভেদ ও অভেদ প্রতিষ্ঠা করার নামই লীলা। এখানে সর্ব্বদাই এক দুই হইতেছে, আবার এই দুই পুনরায় এক হইতেছে। একের মধ্যে জ্ঞানও নাই আনন্দও নাই, ইহা প্রলয়ের অবস্থা। এক ভাঙ্গিয়া যেই দুই হইতে আরম্ভ করে, অমনি সৃষ্টির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হয়; আর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও জাগিয়া উঠে। আর জ্ঞান ও আনন্দ যত বাড়ে, যত ফোটে, ততই আবার এই দুই ক্রমে এক হইতে থাকে। জ্ঞানের ও আনন্দের পূর্ণতায় এই দ্বৈত নষ্ট হয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও লোপ পায়, আনন্দও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কিন্তু নিত্যজ্ঞানের ও নিত্যানন্দের বিলোপ ত সম্ভব নয়। অতএব যেই জ্ঞানের ও আনন্দের পূর্ণতায় জ্ঞাতা-জ্ঞেয় ও ভোক্তা-ভোগ্য এক হইয়া যায়, অমনি

আবার সেই এক ভাঙ্গিয়া দুই হয়। এই ভাঙ্গাগড়া, এই এক হওয়া ও দুই হওয়া, এই মিলন ও বিচ্ছেদ, ইহাই লীলার নিত্য ধর্ম্ম। নিত্য লীলাতে, সে লীলা জ্ঞানের লীলাই হউক, আর প্রেমের বা আনন্দের লীলাই হউক—এই জন্য, নিত্য বিচ্ছেদ ও নিত্য মিলন লাগিয়াই আছে। ইহাই ভাগবত-বর্ণিত নিত্য লীলার মূল তত্ত্ব। কাব্যাকারে ও নাট্যাকারে মহাকবি বেদব্যাস এই লীলাতত্ত্বটিই অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রকৃতি-পুরুষ বা রাধা-কৃষ্ণ।

ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই আছে। জ্ঞাতা ও ভোক্তাকে বিষয়ী আর জ্ঞেয় ও ভোগ্যকে বিষয় বলা যাইতে পারে। আবার পুরুষই বিষয়ী, প্রকৃতিই তাঁর বিষয়। এই পুরুষ ও প্রকৃতি একই সত্তা বা সত্য বা বস্তু, একই তত্ত্ব। সত্তাতে, বস্তুতে, তত্ত্বেতে দুই' এক। প্রকাশেতে কেবল দুই। সত্তাতে অদ্বৈত, প্রকাশে দ্বৈত। সত্তাতে অভেদ, প্রকাশেতে কেবল ভেদ। শ্রীকৃষ্ণই এই অদ্বয়তত্ত্ব। ভাগবত ইহা-কেই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু বলিয়াছেন। আর শ্রীরাধা এই অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুরই জ্ঞেয় ও ভোগ্য। নিত্য-জ্ঞানের জ্ঞেয়ও নিত্য হইবে। পূর্ণজ্ঞানের বিষয়ও পূর্ণ হইবে। জ্ঞেয় যত জ্ঞাতার অনুরূপ হয়, ততই তাহাকে জানিয়া তাঁর জ্ঞাতৃত্ব সার্থক হইয়া থাকে। আনন্দ সম্বন্ধেও এসকল কথা খাটে। নিত্যানন্দের ভোগ্যও নিত্য হওয়া চাই। পূর্ণানন্দের বিষয়ও পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। ভোগ্য যত ভোক্তার অনুরূপ হয় ততই এই ভোগ্যকে আশ্রয় বা সম্ভোগ করিয়া তিনি তাঁর নিজের আনন্দস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সুতরাং সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ যে ভগবান তাঁর প্রকৃতিরও নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁরই অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। শ্রীরাধিকা এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বার্থসাধিকা; তাঁর জ্ঞানের ও আনন্দের পরিপূর্ণ বিষয় ও অবলম্বন। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণেরই সমতুল, তাঁরই সম্পূর্ণ উত্তর-

সাধিকা। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ যাহা চায়, শ্রীরাধিকাতে তাহাই পায়। আবার শ্রীরাধিকা যাহা চান, শ্রীকৃষ্ণেতে তাহাই পান। মোটামোটি ইহাই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

জ্ঞানলীলা ও আনন্দলীলা বা রসলীলা, উভয়বিধ লীলার আত্ম-প্রয়োজনেই পুরুষ ও প্রকৃতির মৌলিক একত্বের মধ্যেই একটা দ্বৈতের ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কিন্তু ঐ একত্ব প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, এই দ্বৈত সর্ব্বদাই আবার অদ্বৈতমুখী হয়, আপনাকে আপনি কি করিয়া নষ্ট করিবে, তারই চেষ্টা করে। আর এই স্বাতন্ত্র্য এবং পরিচ্ছিন্নতাও, এই কারণে, মূলের অদ্বৈত-তত্ত্বের আকর্ষণে, সর্ব্বদাই আত্মবিলোপ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে আপনার মূল আশ্রয়ের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার জন্য লালায়িত হয়। জ্ঞান-লীলার ও আনন্দলীলার এই যে দ্বৈত ও স্বাতন্ত্র্য, তাহাকে ধরিয়াই ভাগবতে রাধাকৃষ্ণের রসলীলার বর্ণনা হইয়াছে। আর কবিরাজগোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, ভাগবতের রাধাকৃষ্ণলীলাতে যেটুকু ফোটে নাই, যেটুকু অপূর্ণ ছিল, তাহাকেই ফুটাইয়া ও পূর্ণ করিয়া, শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অদ্ভুত অবতার-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভাগবত ও চরিতামৃত।

ভাগবতে রাধাকৃষ্ণকে দ্বৈতভাবে দেখিতে পাই। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও দুই। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীরাধা ভিন্ন দেহে প্রকাশিত ও বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাগতপ্রাণ হইয়াও, ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠিত। সত্তাতে, তত্ত্বেতে এক হইয়াও, প্রকাশে, অধিষ্ঠানেতে ইঁহারা দুই। পরমতত্ত্ব কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু। তাঁর মধ্যে এই দ্বৈত কখনও নিত্য হইতে পারে না। দ্বৈত একটা সাময়িক প্রকাশ বা ক্রিয়া বা বিকার মাত্র। ইংরাজি দর্শনের পরিভাষায় ইহাতে অদ্বৈতের moment মাত্র বলা যাইতে পারে। ভাগ-বত এই সাময়িক তত্ত্বটিকে ধরিয়াই অপূর্ব্ব কৃষ্ণলীলার প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ-অভিজ্ঞতাতে, জ্ঞান ও প্রেমের প্রকৃতিতে এই দ্বৈত প্রকাশিত হইয়া, কেবলই অদ্বৈতে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে; আর যতক্ষণ না আবার এক হইয়াছে, ততক্ষণ কি জ্ঞান, কি রস বা আনন্দ, দু'এর কোনটিই পূর্ণ হয় না। যে মূলে এক ছিল, মাঝখানে কেবল দুই হইয়াছে, আর দুই হইয়া কেবলই ঐ মূলের একত্বকে পাইবার জন্য পিপাসিত হইয়া আছে, সে আবার এক হইবেই হইবে। না হইলে, এই ক্রম, এই লীলা, পরিপূর্ণ ও সফল হয় না। ভাগবত-চিত্রিত বৃন্দাবন-লীলাতে অদ্বৈততত্ত্বের আত্মলীলার মধ্যম অঙ্কের অভিনয় মাত্র প্রকটিত হইয়াছে। ইহার শেষ অঙ্ক ত আছে। সেই শেষ অঙ্কের অভিনয় প্রকট হইল কোথায়? শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ কহিলেন—"এখানে, এই বাঙ্গালা দেশে, এই নববৃন্দাবন শ্রীনবদ্বীপধামে আর নীলাচলে।" কবিরাজগোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারের এই অর্থ করিয়াই আপনার গ্রন্থের সূচনায়, "বস্তুনির্দ্দেশস্বরূপ মঙ্গলাচরণে" কহিয়াছেন :—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাব দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

"শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-রূপিণী যে হ্লাদিনী শক্তি তাহাকেই শ্রীরাধা কহে। অতএব শক্তি ও শক্তিশালী এক বলিয়া, রাধাকৃষ্ণও বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন। ইঁহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন হইয়াও পুরাকালে এই ভুবনে (বৃন্দাবনধামে) ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। অধুনা ঐ দুই তত্ত্ব একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপবস্তু, কিন্তু শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুগঠিত। এই শ্রীচৈতন্যাখ্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি।"

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব।

এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকাররূপিণী যে হ্লাদিনী-শক্তি, তাহাকেই শ্রীরাধা কহিয়াছেন। এই বিকারের অর্থ কি? দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ইক্ষুরসের বিকারকে 'ওলা' বা মিছরি কহিয়াছেন। ইক্ষুরস আপনার স্বরূপকে অব্যাহত রাখিয়া এই ওলা বা মিছরিরূপে পরিণত হয়। মিষ্টত্ব ইক্ষুরসের স্বরূপ। ওলার মধ্যে এই স্বরূপটি ঠিক আছে; কিন্তু ঘনীভূত ও দানাদার আকার ধারণ করিয়াছে। অতএব—বস্তুর নিজের অন্তরঙ্গ স্বরূপ অব্যাহত থাকিয়া, অন্য বস্তুর সঙ্গে কোনও প্রকারের যোগাযোগ ব্যতীত, যদি ভিন্ন আকারে পরিণত হয়, তবে এই পরিণামকেই বিকার কহে। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের এইরূপ বিকারই শ্রীরাধা। স্বরূপতঃ শ্রীরাধা কৃষ্ণ-প্রণয়-বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহেন; তবে ভিন্ন আকার ধরিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বস্তু।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।

দেখিয়াছি যে এই সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব নিতান্ত অদ্বৈত বা ভেদরহিত কিম্বা একান্ত দ্বৈত বা ভেদসমন্বিত নহে। ইহাতে ভেদের মধ্যেই অভেদ, আর অভেদের মধ্যেই আবার ভেদ রহিয়াছে। এই তত্ত্ব অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। জ্ঞান-প্রয়োজনে এই ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চিৎ-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আনন্দের বা প্রেমের প্রয়োজনেও এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার আনন্দ-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পরমতত্ত্ব চিদ্বস্তু। অর্থাৎ এই চৈতন্যে বা জ্ঞানেই তাঁহার সত্তার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

> সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
> একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
> আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
> চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

অর্থাৎ পরমতত্ত্বের সকলই চৈতন্যময়। আঘাত পাইলেই প্রতিঘাত করে, ইহাই চৈতন্যের সাধারণ ধর্ম্ম। যাহার এই প্রতিঘাতের শক্তি নাই, তাহাকেই লৌকিক ভাষায় আমরা অচেতন পদার্থ কহি। বিশ্বে কোনও পদার্থেরই এই প্রতিঘাত-শক্তি যে নাই, ইহা বলা কঠিন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অপূর্ব্ব আবিষ্কারের পরে, আধুনিক জড়-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সাহস করিয়া বিশ্বের কোনও পদার্থের যে এরূপ প্রতিঘাত করিবার শক্তি নাই, আর এমন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু অচেতন পদার্থ বলিয়া জগতে কোনও কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, যে বস্তু আঘাত পাইলে সাড়া দেয়, তাহাকেই আমরা সচেতন বলি। সুতরাং

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।—

ইহাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী, আর সম্বিৎ—এই চিচ্ছক্তির এই ত্রিবিধ স্বরূপকে কিছুতেই অচেতন বলিতে পারি না। আমরা সচরাচর শক্তি আর শক্তিমান, এই দুইকে পৃথক করিয়া কল্পনা করি। আর যখনই এরূপ পৃথক করিয়া ভাবি, তখন এই শক্তি মনের ভাব-মাত্রে বা ideaতে পরিণত হয়। এই ভাবকে আমরা সচেতন বলিয়া ভাবিতেই পারি না। ভগবানের এই যে ত্রিবিধ শক্তির কথা হইল, হঠাৎ তাহাকেও আমরা এইরূপ একটা মানসবস্তু বলিয়াই ধরিয়া লই। শুক্লত্ব, কৃষ্ণত্ব, প্রভৃতি, কিম্বা সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য, কারুণ্য প্রভৃতি যেমন আমাদের নিকটে মনের ভাবমাত্র, সেইরূপ ভগবানের এই হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎকেও আপাতত কেবল একটা মনোভাব বলিয়াই মনে হয়। আর ঠিক এটি যাতে আমরা মনে না করিতে পারি, তারই জন্য এখানে কবিরাজ গোস্বামী প্রথমে—

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥

এই কথা কহিয়াছেন। হ্লাদিনী প্রভৃতি একই চিৎ-শক্তির ভিন্ন

ভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। অতএব এই হ্লাদিনী প্রভৃতিও চিদ্বস্তু। আধুনিক ভাষায় আমরা যাহাকে শক্তি বলি, হ্লাদিনী ঠিক তাহা নহে। চৈতন্যসম্পন্না শক্তিকে আমরা সুধু শক্তি বলি না, তাহাকে জীব কহি। যে-শক্তির চৈতন্য নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে জড়-শক্তি কহিয়া থাকি। হ্লাদিনী পূর্ণ-সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-শক্তির রূপ বলিয়া, তাহা কেবল মনোভাবও নহে, আর অচেতন জড় শক্তিও নহে। ইংরাজিতে ইহাকে শক্তি বা force বলিতে পারি না, ব্যক্তি বা person বলিতে হয়। ভগবান স্বয়ং যেমন কেবল একটা মনোভাব—logical abstraction—নহেন; কিন্তু পুরুষ, person; সেইরূপ তাঁর এই যে হ্লাদিনী-শক্তি ইহাও কেবল মানসবস্তু, logical abstraction অথবা psychological generalisation নহেন, কিন্তু person—একটি বিশিষ্ট সচেতন বস্তু; ভগবান আপনি যেমন স্বাভাবিকী-জ্ঞানবলক্রিয়াসম্পন্ন, এই হ্লাদিনী-শক্তি-রূপিণী শ্রীরাধাও সেইরূপ স্বাভাবিকী-জ্ঞানবলক্রিয়াসম্পন্না। এই জন্য ভগবানের সঙ্গে তাঁর ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদান, উত্তর-প্রত্যুত্তর, জ্ঞান-ভাব-ও-কর্ম্মের বিনিময় চলে। যদি বল, তাহা হইলে ভগবৎস্বরূপের একত্ব ও অদ্বৈতত্ব নষ্ট হইয়া যায়; তাহা হইলে জীবের সঙ্গেও ত ভগবানের এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এই আদান-প্রদান, এই উত্তর-প্রত্যুত্তর, এই জ্ঞান-ভাব-ও-কর্ম্মের অন্যোন্য সম্বন্ধ আছে। ইহাতে যদি ভগবানের অদ্বৈতত্ব, বা অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ নষ্ট না হয়, শ্রীরাধিকার সঙ্গে ইহারই অনুরূপ সম্বন্ধেতে তাহা নষ্ট হইবে কেন? ফলতঃ যে পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বের উপরে এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে শ্রীরাধাতে আর জীবেতে সজাতীয় ভেদমাত্র আছে, বিজাতীয় ভেদ নাই। ভগবানের অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাঁর নিত্য-স্বরূপের মধ্যেই, নিত্য-অন্তরঙ্গ-লীলা-প্রয়োজনে তাঁর প্রণয়বিকাররূপিণী হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপা শ্রীরাধাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, আমাদের বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এই অপূর্ব্ব ভাগবতী লীলার কথা

প্রচার করিয়াছেন। এই তত্ত্বের আশ্রয়েই, বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাধনে রাধাকৃষ্ণের লীলার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণে প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণের আনন্দাস্বাদন।

শ্রীকৃষ্ণ-পরমতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। বলিয়াছি যে ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধেতে আনন্দের প্রতিষ্ঠা, এই সম্বন্ধ ব্যতীত আনন্দ অসম্ভব ও অসাধ্য। আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের মধ্যে এই ভোক্তাভোগ্য সম্বন্ধ নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। আর তাঁর প্রণয়ের বিকার-রূপিণী হ্লাদিনী শক্তিই এখানে ভোগ্য। এইজন্যই—

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

কিন্তু ভগবান আত্মারাম। তিনি তাঁর নিজের প্রেমই নিজে আস্বাদন করেন। তাঁর ত কোনও বিষয়েই অন্যের অপেক্ষা নাই। থাকিলে তিনি পূর্ণ-তত্ত্ব ও অদ্বৈত-তত্ত্ব হইতেন না। সুতরাং তাঁর ভোগের বা আনন্দের বিষয় তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তাঁর নিজের প্রেমের উপাদানেই নির্ম্মিত।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণমণি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা, ক্রীড়ার সহায়॥

জ্ঞানের দিক দিয়া, জ্ঞানের বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন:—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥

"রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়বিকৃতি"—ইত্যাদি শ্লোকই এই পঞ্চম শ্লোক। আর ইহাতে জ্ঞানের দিক্ দিয়াই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার মহাপ্রভুর অবতার-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চৈতন্যাবতার ও রসতত্ত্ব।

পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকেতে রসের দিক দিয়া এই অবতার-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে শ্রীচৈতন্যাবতারের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া, এই ষষ্ঠ শ্লোকে তার প্রয়োজন প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইলেন। কেন?—না, তিনটি প্রয়োজনের প্রেরণায়। প্রথম—শ্রীরাধা তাঁহাকে যে প্রেম করেন, সেই প্রেমের মহিমা কীদৃশ, ইহা জানিবার লোভে। দ্বিতীয়—এই প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধিকা তাঁহার যে অদ্ভুত মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্য্যই বা কীদৃশ, ইহা আস্বাদন করিবার লোভে। তৃতীয়—শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধা যে সুখপ্রাপ্ত হন, সেই সুখই বা কীদৃশ, ইহা অনুভব করিবার লোভে। এই ত্রিবিধ লোভ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ী, তিনি জ্ঞাতা ও ভোক্তা। শ্রীরাধিকা তাঁর ভোগ্য, তাঁর আনন্দের আশ্রয়। আর তিনি শ্রীরাধার আনন্দের বিষয়। কিন্তু রসের সম্বন্ধেতে আমরা একদিক মাত্র প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎভাবে আস্বাদন করি, অন্যদিক আমাদের অনুভবের ও আস্বাদনের অতীত থাকিয়া যায়। সখ্য সম্বন্ধেতে সখাকে আশ্রয় করিয়া আমি যে রস আস্বাদন করি, তাই কেবল বুঝি ও জানি; আমাকে আশ্রয় করিয়া সখা কি রস আস্বাদন করেন, তার প্রত্যক্ষ অনুভব ত আমার হয় না। বাৎসল্যে মার নিজের প্রাণ সন্তানের জন্য কি করে, তাই কেবল জানেন; সন্তানের প্রাণ তাঁর জন্য কি করে, ইহা ত জানেন না। পতি-পত্নী সম্বন্ধেও ইহা সত্য, বোধ হয় আরও বেশী সত্য। আমরা পুরুষ, সতীর অকৈতব প্রেম আস্বাদন করিয়া আমাদের দেহমনপ্রাণে কি অনুভব হয়, তাই কেবল জানি ও বুঝি; আমাদের প্রেমাস্বাদনে সতীর দেহমনপ্রাণ যে কি করে, তাহার সাক্ষাৎ অনুভূতি ত আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়! আমরা তার কিছুই বুঝি না। অথচ ঐটির প্রত্যক্ষ অনুভব-লাভের জন্য আমরা লালায়িত হই। ঐটি না জানিলে আমাদের রস ও আনন্দ যেন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহা রসের নিত্য ধর্ম্ম। জ্ঞান যেমন দ্বৈত-প্রতিষ্ঠা করিয়া আবার নিয়তই সেই দ্বৈতকে নষ্ট করিতে চায়; রস সেইরূপ কেবল নিজের আনন্দানুভূতিতে তৃপ্ত হয় না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই অপূর্ব্ব আনন্দানুভব করে, সে কিরূপ আনন্দ অনুভব করে বা করিয়া থাকে, তাহাও জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়। আর এই ব্যাকুলতা বা লোভকে ধরিয়াই কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো"—ইত্যাদি শ্লোকে এই রসতত্ত্বটিই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রুতি যাহাকে—"রসো বৈ সঃ"—কহিয়াছেন, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। "রসংহেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি"—এই রসস্বরূপ যে

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রস পাইয়াই জীবসকল আনন্দিত হয়। এই শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের কণামাত্র পাইয়া সমুদায় জীব জীবনধারণ করে। এই আনন্দ না পাইলে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ—কেইবা জীবনধারণ করিত, কেইবা প্রাণচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইত? এই সকল প্রাচীন শ্রুতির অনুসরণ করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন্॥

কিন্তু এমন জন আছে দেখিতেছি, সে শ্রীরাধা। আমি এক শ্রীরাধাতেই এই আনন্দ অনুভব করি।

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষে ভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধা অঙ্গ-গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥

কিন্তু তা হইলে হইবে কি? শ্রীরাধিকাতে শ্রীকৃষ্ণ যে সুখ ও আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীরাধা তাঁহাতে তদপেক্ষা কোটী গুণ বেশী আনন্দ প্রাপ্ত হন।

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অচেতন॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন (১)।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
"কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে"।
এই সুখে মগ্ন রহে, বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হৈয়া অন্ধ॥
তাম্বুলচর্চ্চিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডোবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা-অন্তে সুখে ইহার যে অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি।
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥
তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তাঁরে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য প্রাণে লোভ বাড়ে চিতে॥

এই লোভতৃপ্তির একমাত্র উপায় আছে। রাধিকা না হইলে,

---

(১) আমি বাঁশী বাজাই বলিয়া, বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ হইয়া যখন আপনি বংশীধ্বনি হয়, তাহাতে পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকাকে, আমার ভাবভাবিত করিয়া অচেতন করিয়া ফেলে।

রাধিকা কি সুখ পান, ইহা বুঝা অসম্ভব ও অসাধ্য। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা অনুভব করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত। আর এই প্রণয়ের দ্বারা শ্রীরাধা তাঁর যে মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই আস্বাদন পাইবার জন্যও শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত। আর শ্রীকৃষ্ণের অনুভবে শ্রীরাধার কি সুখ হয়, তাহাও অনুভব করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃষিত। রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই তিন তৃষ্ণা নিত্যকাল আছে। আর শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভাবেন—

এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব, কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি, ধরি তাঁর বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥"

কৃষ্ণ-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণের সিদ্ধান্তে ইহাই মহাপ্রভুর অবতারের নিগূঢ় প্রয়োজন ও মর্ম্ম। দ্বাপরে শ্রীবৃন্দাবনে দুই ভিন্ন দেহেতে রাধাকৃষ্ণের যে লীলা প্রকাশিত হইয়াছিল, এই কলিযুগে শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারে, এই বাঙ্গালাদেশে, নবদ্বীপে ও নীলাচলে, বিশেষতঃ নীলাচলে, একই দেহেতে সেই অপূর্ব্ব প্রেমলীলার পুনরভিনয় হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই মহাপ্রভুর ভজনাদি করিয়া থাকেন।

রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা নিত্য হইলেও, কলিতে অপ্রকট হইয়া গিয়াছিল। ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবান সাধক আপনার নিগূঢ়তম অন্তরঙ্গ অনুভূতিতে এই লীলা প্রত্যক্ষ এবং আস্বাদন করিলেও, জনসাধারণের নিকটে ইহার যাথার্থ্য ও মর্ম্ম লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনার জীবনে পুনরায় এই লীলাটিকে

প্রকট করিয়া তুলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মহাপ্রভুর মধ্যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায়, ভাবস্বভাবে, আচার আচরণে, তাঁহার দেহেতে যে সকল সাত্ত্বিকীবিকার প্রকাশ হইত, তাহার আশ্রয়ে, ঐ প্রাচীন পৌরাণিকী লীলার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভ করিয়া, কৃষ্ণলীলা বস্তুটি সত্য সত্য যে কি, ইহা বুঝিয়াছিলেন। এই প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গ-লীলা অপ্রত্যক্ষ কৃষ্ণলীলার নিগূঢ় রস-ভাণ্ডারের চাবিটি যেন তাঁহাদের হাতে দিয়াছিল। এই প্রত্যক্ষ গৌরাঙ্গ-লীলার অভিধানে তাঁহারা কৃষ্ণলীলার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারিয়াছিলেন। আর এই জন্যই মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে, তাঁহার ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণলীলাগান করিবার সময়, এই গৌরাঙ্গ-লীলাটি স্মরণ করিয়া থাকেন।

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।

অনুবাদ আগে না কহিয়া বিধেয় কহিবে না। কহিলে বিধেয়ের মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে না, হইতে পারে না। আর

বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকটে তাঁর লীলাটি জ্ঞাত ছিল। কৃষ্ণলীলা ছিল অজ্ঞাত। এই কৃষ্ণলীলাই মহাজনপদের বিষয়। পদাবলী কীর্ত্তনে ইহা বিধেয়স্বরূপ। অতএব মহাপ্রভুর তিরোভাবের পরে তাঁর ভক্তগণ কৃষ্ণলীলা গান করিবার সময়, আগে অনুবাদস্বরূপ গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করিয়া, পরে বিধেয়স্বরূপ কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। ইঁহাই "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" আদিম, মুখ্য ও সত্য অর্থ।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অনন্ত

হে কাল হে মহাকাল,
অনন্ত অশেষ ;
নিত্য নিত্য হেরি তব
নব নব বেশ।
হে অনাদি হে অসীম
সুন্দর মহান্,
তোমারে ধরিতে নারে
মানবের প্রাণ।
বিভক্ত করেছে তাই
খণ্ড খণ্ড ক'রে ;
পল, দণ্ড, দিন, মাস,
বছরে বছরে।
হে ব্রহ্ম, হে মহাদেব,
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ;
বিশ্বমাঝে তব লীলা,
অনির্ব্বচনীয়।
হে অনাদি হে অসীম,
সুন্দর মহান্,
তোমারে ধরিতে নারে,
মানবের প্রাণ।
বিভক্ত করেছে তাই,
ভক্ত চুপে চুপে,
সামান্য তেত্রিশ কোটী
দেবদেবীরূপে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন।

শাব্দিক শাকটায়ন

সংস্কৃত সাহিত্যের যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন শাকটায়ন তাঁহাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। মহর্ষি পাণিনির পূর্ব্ব হইতেই শাকটায়ন পরম শাব্দিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার কি গ্রন্থ ছিল তাহার বার্ত্তা আমরা অবগত নহি; তবে যাস্কের ন্যায় শব্দশাস্ত্রবিৎ, এবং পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ন্যায় ব্যাকরণদর্শী তাঁহার নাম সগৌরবে কীর্ত্তন করিয়াছেন—কেবল ইহাই শাকটায়নের পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া কথিত হইতে পারে। ইঁহাদের পরেও অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকার স্ব স্ব গ্রন্থে শাকটায়নের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার বোপদেব তদীয় "কবিকল্পদ্রুম"গ্রন্থে তাঁহাকে অষ্ট-মহাশাব্দিকের অন্যতম বলিয়া গণনা করিয়াছেন। শাকটায়ন প্রভৃতির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উক্ত লেখক কবিকল্পদ্রুম রচনা করেন। যথা:—

> ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
> পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ ॥ ২ ।
> মতানি তেষামালোক্য সর্ব্বসাধারণঃ স্ফুটঃ।
> ধাতুপাঠঃ স্বদাদ্যন্তক্রমাদন্ত্যাদিমক্রমঃ।
> কবিকল্পদ্রুমো নাম পদ্যৈর্নিষ্পাদ্যতেঽত্র চ।
> ধাতবঃ পঠিতাঃ পাঠসূত্রলোকাগমস্থিরাঃ ॥ ৩ ।
> —কবিকল্পদ্রুম, শিবনারায়ণ শিরোমণি সম্পাদিত
> —পৃঃ ২-৩।

প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থলেই শাকটায়নের নাম

পাওয়া যায়। একজন শাকটায়নের নামই এতবার উল্লিখিত হই-য়াছে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। পণ্ডিতবর Aufrecht পুরাতন সংস্কৃত পুঁথির আলোচনা করিতে যাইয়া এই সিদ্ধান্ত করি-য়াছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে তিনজন শাকটায়ন ছিলেন। (১) ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির নামই ঋক্ প্রাতিশাখ্যে, রাজসেনেয় প্রাতিশাখ্যে, অথর্ব্ব প্রাতিশাখ্যে, যাস্কের নিরুক্তে, বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে এবং পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি-কর্ত্তৃক নানাপ্রসঙ্গে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। মহামুনি পতঞ্জলি লিখিয়াছেন (২) :—

নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।
বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ ধতুজং নাম॥

দ্বিতীয় শাকটায়নের নাম আমরা ক্ষীরস্বামী, হেমচন্দ্র, বোপদেব, জয়মঙ্গল, মল্লিনাথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এই দুইজন ব্যতীত আর একজন শাকটায়নেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি 'অভিনব-শাকটায়ন' নামে পরিচিত। ইনি "শব্দানু-শাসন" নামক ব্যাকরণের রচয়িতা। বহুদিন পূর্ব্বে স্বর্গগত ডাক্তার বুলর [Dr. E. Bühler] ইঁহাকেই পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাকটায়ন নামা অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (৩) তৎপরে প্রখ্যাতনামা ডাক্তার কীল্‌হর্ণ্ অভিনব-শাকটায়নের বিরচিত ব্যাকরণের একটি পরিচয় ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুয়ারি পত্রে (৪) প্রকাশ করেন। উহাতে শাকটায়নের গ্রন্থের সামান্যতঃ পরিচয়মাত্র দেওয়া

---

(১) Catalogus Catalogorum—Vol. I. P. 638.

(২) Kielhorn's Mahabhasya—3. 4. III.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1864. Pp. 203-8.

(৪) Indian Antiquary—1887.

হইয়াছিল, বুলরের মতের কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। কিন্তু কীলহর্ণ যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, উক্ত প্রবন্ধে তাহার ইঙ্গিত ছিল। সম্প্রতি বোম্বাইনগর হইতে শ্রীযুত জ্যেষ্ঠারাম মুকুন্দজী ও পন্নালাল জৈন কর্তৃক শাকটায়নের শব্দানুশাসন প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রস্তাবনায় এই শাকটায়ন যে পাণিনি প্রভৃতির পূর্ব্বগামী এবং জৈনধর্ম্মাবলম্বী তাহা [অবশ্য বিনা প্রমাণে] প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক তাহা এখানে দেখাইব।

বুলর সাহেবের এক বন্ধু শাকটায়নের শব্দানুশাসন, তাহার যক্ষবর্ম্মকৃত 'চিন্তামণিবৃত্তি' এবং অভয়চন্দ্র সূরিবিরচিত "প্রক্রিয়া সংগ্রহ" নামক শব্দানুশাসন টীকার অংশবিশেষ সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার বুলরের নিকট প্রেরণ করেন। যক্ষবর্ম্মার চিন্তামণিবৃত্তির প্রারম্ভে নিম্নধৃত শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়:—

স্বস্তি শ্রীসকলজ্ঞানসাম্রাজ্যপদমাপ্তবান্।
মহাশ্রমণসঙ্ঘাধিপতির্যঃ শাকটায়নঃ ॥ ৩।
একঃ শব্দাম্বুধিং বুদ্ধিমন্দরেণ প্রমথ্য যঃ।
সযশঃশ্রি সমুদ্দধ্রে বিশ্বং ব্যাকরণামৃতম্ ॥ ৪।

*   *   *   *   *

ইন্দ্রচন্দ্রাদিভিঃ শাব্দৈর্যদুক্তং শব্দলক্ষণম্।
তদিহাস্তি সমস্তং চ যন্নেহাস্তি নতৎ ক্বচিৎ ॥ ১০।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের প্রথমটিতে শাকটায়নকে "মহাশ্রমণ-সঙ্ঘাধিপতি" বলা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে তিনি বৌদ্ধ অথবা জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শব্দানুশাসনের টীকাকারগণ শাকটায়নকে জৈন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশম শ্লোক হইতে জানিতে পারি যে, ইন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি বৈয়াকরণগণের গ্রন্থ শাকটায়ন দেখিয়াছিলেন, এবং

তাঁহারা স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে যেসকল শব্দ-লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছিলেন তাহার সমস্তই শব্দানুশাসনে সংগৃহীত হইয়াছে। চিন্তামণিবৃত্তির এই দুইটি শ্লোক হইতে দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে :— (১ম) শাকটায়ন বুদ্ধদেব বা জিন মহাবীরের পরবর্ত্তী ; (২য়) এবং বৈয়াকরণ চন্দ্র বা চন্দ্রগোমী শাকটায়নের পূর্ব্বগামী। গোল্ডষ্টুকারের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। (৫) ইহা যদি সত্য হয়, তবে পাণিনির পরে শাকটায়নের আবির্ভাবকাল গণনা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু উক্ত মতের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও কোনও পণ্ডিত সন্দিহান হইয়াছেন। অতএব গোল্ডষ্টুকারের মত পরিত্যাগ করিয়া অন্য উপায় অবলম্বন করাই প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুমোদিত। চিন্তামণিবৃত্তি হইতে [১০ম শ্লোক] পাওয়া যাইতেছে যে শাকটায়ন চন্দ্রগোমীর পরবর্ত্তী।

চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ (৬) কিছুদিন পূর্ব্বে জর্ম্মাণি দেশের লীপজিগনগর হইতে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ওই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় চন্দ্রগোমী পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি ব্যাকরণকারগণের নিকট হইতে যথেষ্ট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বহুপরবর্ত্তী কাশিকাগ্রন্থ দর্শন করিবার সুযোগও তাঁহার ঘটিয়াছিল। পাণিনির "ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্র—" [৪।১।৪৯] ইত্যাদি সূত্রের বার্ত্তিকে কাত্যায়ন লিখিয়াছেন "যবনাল্লিপ্যাম্" অর্থাৎ লিপি বুঝাইলে 'যবন'শব্দের উত্তর আনুক প্রত্যয় হয় এবং যবনানী পদ সিদ্ধ হয়। চান্দ্রব্যাকরণেও [২।৩।৫৪] অবিকল এই বার্ত্তিকসূত্রটি দেখা যায়। "কম্বোজাল্লুক্" [৪।১।১৭৫] পাণিনির সূত্র। কাত্যায়ন

(৫) Goldstücker's Panini. Pp. 225-227.

(৬) Die Grammatik Des Candragomin by Bruno Liebich. Leipzig, 1902.

ইহার বৃত্তিপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন "কম্বোজাদিভ্য ইতি বক্তব্যম্"। চান্দ্রব্যাকরণেও আছে "কম্বোজাদিভ্যো লুক্" [২।৪।১০৪]। মাত্র এই দুইটি সূত্র হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পাণিনির বহু পরে চন্দ্রগোমী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং শাকটায়ন, যিনি চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ দেখিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই পাণিনির বহু পরবর্ত্তী।

ইহা ভিন্নও আর এক উপায়ে ডাক্তার বুলরের মত খণ্ডন করা যায়। শব্দানুশাসনপাঠে আমরা এমন সকল সূত্র লক্ষ্য করিয়া থাকি যেসকল সূত্র, পাণিনি ও কাত্যায়নের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত লেখক কখনও রচনা করিতে পারিতেন না। নিম্নে এইরূপ কতকগুলি সূত্র প্রদত্ত হইল।

শাকটায়ন	পাণিনি ও কাত্যায়ন
প্রস্তোঢোঢ্যূহৈষৈষ্যে [১।১।৮৪]	৬।১।৮৯
আতৃতীয়ায়া ঋতে [১।১।৮৯)	"
প্রদশার্ণবসন কম্বলবৎসতরস্যার্ণে [১।১।৯০]	"
শশ্ছোঽমি [১।৩।৫৬]	৮।৪।৪৩
যবনযবাল্লিপিদুষ্টে [১।৩।৫৬]	৪।১।৫৯
বর্ণস্রাত্রমনুপূর্ব্বম্ [২।১।১২০]	২।২।৩৪
সম্পাদাদিভ্যঃ ক্তিন্ ক্বিপ্ [৪।৪।৭২]	৩।৩।৯৪
মূলবিভুজাদয়ঃ [৪।৩।৭৪]	৩।২।৩

পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীর তিনটি সূত্রে শাকটায়নের মত উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দানুশাসনেও উক্ত মতের প্রতিধ্বনি আছে। ইহা হইতে বুলর বলিতে চাহেন, উক্ত শাকটায়নই শব্দানুশাসনের প্রণেতা। পাণিনির ওই তিনটি সূত্র এবং শব্দানুশাসনের তদর্থক তিনটি সূত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

পাণিনি	শাকটায়
"ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য"	অচোহ্বোইত্বচঃ [১।১।১১৭]
লঙঃ শাকটায়নস্যৈব [৩।৪।১১]	আদ্দিঘোষৈর্জু স্বা [১।৪।১০৫]
ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য [৮।৩।১৮]	বা মু এপ্যাৎ [১।১।১৫৫]

এই তিনটি স্থলে পাণিনি ও শাকটায়নের মতসাদৃশ্য হওয়া আদৌ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী শাকটায়নের মত যে, এই পরবর্ত্তী শাকটায়ন গ্রহণ করিয়া সূত্র রচনা করিতে পারেন না তাহা নহে। পাণিনি যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই শব্দানুশাসনে অবিকল দেখা যায়। উভয়ের অনেক সূত্রে আশ্চর্য্যরকম ভাষার ঐক্য লক্ষিত হয়। এতদ্দৃষ্টে পাণিনিকে [অভিনব] শাকটায়নের পরবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করা, এবং পাণিনি এই শাকটায়নের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়াই অষ্টাধ্যায়ী সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, এই প্রকার মত প্রকাশ করা সুধীসমাজে হাস্যজনক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। উপরে শব্দানুশাসনের যে তিনটি সূত্র উদ্ধৃত হইল তাহার একটি [আদ্দিঘোষৈর্জু স্বা—১।৪।১০৫] সূত্রের অনুরূপ সূত্র চান্দ্রব্যাকরণেও পাওয়া যায়। তাহা এই—"ঝৈর্জু স্" [চা-১।৪।৪০]। সম্ভবতঃ শাকটায়ন চান্দ্রব্যাকরণ হইতেই তাঁহার নিজের সূত্রটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শব্দানুশাসনপ্রণেতা শাকটায়ন যে বিভিন্ন ব্যক্তি তাহা আমরা প্রমাণ করিয়াছি। বুলর লিখিয়াছিলেন, "It can be clearly established that, Panini's Grammar is a very much *amplified and corrected edition* of Sakatayana's, and by no means what we should call an original work."(৭) কিন্তু পাণিনির বিরুদ্ধে যে এ অভিযোগ চলিতে পারে না তাহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

---

(৭) J. A. S. B. 1864, p. 207.

শব্দানুশাসনের প্রণেতা শাকটায়ন ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হন বলা যায় না। তিনি জৈন ছিলেন। শব্দানুশাসনের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি 'শ্রুতকেবলি'দেশের অধিবাসী ছিলেন। (৮) শ্রুতকেবলি কোথায় জানি না। শব্দানুশাসনও জৈন-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অমোঘবৃত্তি, শাকটায়নসূত্রন্যাস, চিন্তামণিবৃত্তি, প্রক্রিয়াসংগ্রহ, চিন্তামণি প্রদীপ, ন্যাস, রূপসিদ্ধি প্রভৃতি শব্দানুশাসনের অনেক টীকাগ্রন্থ এখনও প্রচলিত আছে। পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ যে শব্দকোবিদ শাক-টায়নের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি শব্দানুশাসনের প্রণেতা শাক-টায়ন নহেন ইহাই প্রতিপন্ন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত-বর Aufrecht তিনজন শাকটায়নের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনজন শাকটায়ন ছিলেন কি না জানি না; তবে সংস্কৃত সাহিত্যে যে দুইজন শাকটায়নের নাম পাওয়া যাইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

---

(৮) "ইতি শ্রুতকেবলিদেশীয়াচার্য্যস্য শাকটায়নস্য কৃতৌ শব্দানুশাসনে চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদঃ॥"

"নিতুই নতুন"

তা বইকি ? নিতুই নতুনই ত চাই! নয় ত একঘেয়ে হলেই ত আয়াস আসবে। শুধু এক কবুল, কাঠাম এক রাখ্‌তে হবে, তার-পর তুমি কারিগর ভাল হও ত কথাই নাই! নিতুই নতুন না হবে কেন ? ফেল সব পুরাণ ভেঙ্গে ফেল! গড় ফের পাল্টে গড়, ঐ ভাঙ্গা চুরা দিয়েই গড়। ফেল্‌বে না কিছু! ফেল্‌তে নাই কিছু! এই ঠিক থাক্‌লেই সব ঠিক রইল। বুঝে শুনে মনকে একটু উপরি মজুরি দেও, তার সঙ্গে একটা রফা কর, বস্ নিতুই নতুন মিলবে। কেমন করে জিজ্ঞেস্ কোর্‌ছ ? কেন ? মনের উপর তোমার তেমন আস্থা নাই ? তা তার উপর একটু নজর রাখ্‌তে হবে অবিশ্যি। তোমার সঙ্গে বোঝা পড়া ঐ চোখের! চোখ্ মেললেই কেউ দেখেনা! দেখ্‌তে শিখ্‌তে হয়। তুমি চোখ মেলে চেয়ে আছ কিন্তু তোমার মন সয়তান তোমাকে নিয়ে গেছে সেই কোথায় কোন্ রাজ্যে তুমি তা টেরও পেলে না। যদি চোখ্ দুটকে রেখে দেও মনের খবরদারি কর্‌তে, তবেই আর কোন গলদ থাকে না। সে যেখানে যাবে মনও সেইখানে যাবে। কি জান! এই চোখের দেখাকে মন বড় ভয় করে। যা তা সে যোগাবেনা। প্রথম প্রথম নিতুই নতুনের আকার বড় খপ্‌সুরৎ হবে, নয় ত চোখ্‌কে বশ করা যাবে না। বস্ একবার বশ হলে আর কার পরোয়া ? সুন্দর! সুন্দর! আহা বড় সুন্দর তোমরা চেয়ে দেখ না গো কি সুন্দর! আমি যে আর চোখ্ ফে'রাতে পারি না! মন তখন মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে বল্‌ছে "দাঁড়াও না এরপর আর কি সুন্দর আমি যোগাতে পার্‌ব ?, তখন অসুন্দরও দেখ্‌তে হবে ? আমার সঙ্গে কথাই হলো "নিতুই নতুন", সুন্দর অসুন্দর সে তোমার চোখ

জানে"। তাই যখন সুন্দরে প্রাণটা বড় মজ্‌ল, তখন মনের ভাঙ্গনি গাঁথুনি কেমন রাজ্যিছাড়া হতে লাগ্‌ল। কিন্তু আমি যে আমার পুরাণ কাঠামকে আঁকড়ে ধরে আছি! তাতে করে যে মূর্ত্তিই খাড়া কর না কেন! কিবা রুদ্র কিবা স্নিগ্ধ, চোখ আমার তাতেই পড়ে আছে। যেদিন এই কাঠামকে বিসর্জ্জন দিব, সে দিনই পুরাণে এসে পড়্‌ব, অসুন্দরে এসে ঠেক্‌ব। তখন "নূতন" "নূতন" করে চেঁচামেচি কর্‌লে মনের সাধ্যি নাই নূতন সে গড়ে, চোখের ক্ষমতাই নাই নূতন সে দেখায়। একটা একটানার মধ্যে পড়ে চোখ আর মন হাবুডুবু খেতে থাকে, দেখে তখন আমার পায় হাসি। তাই কাজেই কাঠাম নড়চড় কর্‌তে মন তত রাজি নয়। তাতে তার সুবিধে কত! ঘুর্‌তে হয় না ফির্‌তে হয় না, পছন্দ অপ-ছন্দের ভাবনা থাকে না। আদত জিনিষ মজুত আছে তাতে মূর্ত্তি বসিয়ে দেওনা যত রকম পার? তোমরা কাঠাম শুদ্ধ ভাসিয়ে দেও, তাইতে মূর্ত্তি গড়তে তোমাদের এত হয়রাণ হতে হয়। সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমাদের "নিতুই নতুনে" আমার মন ওঠেনা। তোমরা জড় কাঠামে মূর্ত্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তবে তার পূজা কর! তাই পূজার শেষে সবশুদ্ধ জলা-ঞ্জলি দিতে তোমাদের দরদ লাগে না। আমার পূজার আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই। আমি আমার নিতুই নতুন পূজার শেষে মনকে তাগিদ দি পুরাণ গড়ন সব ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে! বস্ মূর্ত্তির সঙ্গে সে পুরাতন চলে যায়, তখন নূতন নূতন "নিতুই নূতন"। উঃ তোমাদের বড় সাহস তোমরা নিতুই নতুন কাঠাম ধর্‌তে যাও, আমি তা মর্‌লেও পারি না। আমার চোখ তা দেয় না। সে বলে জড় দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাতেও জড়তা এসে যায়। আমার যে কাঠামেতে প্রাণ, মূর্ত্তিতে ত নয়! গোলই যে এইখানে। দেখ্‌ছনা কি যে আমার জীবন্ত কাঠাম মনের কাছে কেমন করযোড় করে আছে, আর মন আমার চোখের কত খোসামৎ করছে। নিতুই নূতন দেখা

কি গো মুখের কথা। চোখের যদি একবার পুরাতন দেখ্‌বার ঝেঁাক চড়ে, তবেই তুমি গেলে! আহা মন বেচারার তখন প্রাণান্ত। তার সদা ভয় না জানি কখন তাকে ফাঁকি দিয়ে চোখ দেখে লয়, তবেই যে সব মাটি! তাই একলা চোখ্‌কে ছেড়ে দিতে নাই, সে যেন আগ বাড়িয়ে দেখ্‌তে যেতে না পায়। শুনছনা কি যে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একই বুলি "শুধু চোখের দেখা দিতে এস না"। কেউ তা চায় না! খালি চোখ দেখে কতটা? তার দেখবার শক্তি কতটুকু? তবু যে তার মনরাখা! সে কেবল তা না রেখে তোমার উদ্ধার নাই বলে। অন্ধজনে যে দেখ্‌তে পায় না গো! তাই খোলা চোখ চাই, তাতে চাহনি থাকা লাগে। তারপর সেই খোলা চোখের চাহনির মাঝখানে মনকে এনে দাঁড় কর, তবে ত "নিতুই নতুন" আটক পড়বে। তাই বল্‌ছিলাম যদি পুরাতন দেখা বর্জ্জন করতে চাও তবে আপন চোখের ভজনা কর। যদি তাকে তুষ্ট রাখ্‌তে পার তবেই সে তোমার দিলকে দরিয়া করে দিবে। তখন সে দরিয়ার স্বচ্ছ সলিলে তুমি একই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত কর না কেন, দুইবার এক রকম দেখবে না। মোহন! মোহন! মনো মোহন! নিতুই নতুন!' সে নব নব মুরতির বিদ্যুৎ-ছটাতে তোমার আঁখিতেও বিজলী চম্‌কাবে। কিন্তু আকাশের মত খোলা প্রাণ না হলে, তাতে ঝড়ঝাপ্‌টার আয়োজন না থাক্‌লে, নিবিড় হয়ে এসে চাহনিতে চাহনিতে ধাক্কা না লাগ্‌লে সে আলোর স্ফুরণ ত হবে না! নিমেষে নিমেষে নিতুই নূতনকে ত দেখ্‌বে না! চাঁদের আলো স্নিগ্ধ আলো! মিঠা আলো! সে আলোতে আঁখি জুড়িয়ে যায়, মধু করে দেখায়! কিন্তু মধুর দেখা মিঠে দেখা—নূতন দেখা নয়। তাতে করে আয়েসের হাত থেকে এড়ান যায় না, পুরাণ দেখ্‌বার আতঙ্ক ত দূর হয় না। শুধু সুধার আস্বাদ দিয়ে তোমাকে মাতিয়ে রাখে। চক্ষু অন্ধ করে দেয়। ডোবাও তবে চাঁদকে ডোবাও! আন তবে চিদাকাশে মেঘকে ডেকে আন, ঢাক সব

আলো ঢেকে ফেল। আঁধার! আঁধার! আঁধার! দিগদিগন্ত জুড়ে অন্ধকার! খোল তখন দুয়ার খোল। এস তখন বাইরে এসে দাঁড়াও। তারপর উর্দ্ধপানে চোখ রাখ ত দেখ্‌বে সকল আঁধার ভেদ করে তোমার আঁখিতে কি আলোক এসে পড়েছে। তবে, হে আমার আলোকসর্ব্বস্ব আঁখি! যতদিন এজীবন ধরি, যদি এম্‌নি করে খুসী মাফিক আপনার চিত্তমাঝে ঘনঘটা স্বজন কর্‌তে পারি, আর তাতে এসে এম্‌নি করে বিদ্যুৎ-ছটা চম্‌কাতে থাকে, তবেই না জড়বৎ পাষাণের মত তোমার ঐ পলকহীন দৃষ্টিতে সেই সত্য সনাতন নিতুই নূতনকে দেখ্‌তে পারি। তখন আয়েস আর আস্‌বে না যে, আঁখেরি দেখারও শেষ হবে না দেখ্‌ছিই দেখ্‌ছিই দেখ্‌ছিই! তোমাতে বিজলী সম্পাতে ত প্রাণপাত হবে না, প্রাণকে যে পাওয়াবে। তখন সেখানে গিয়ে ওযে নিতুই নূতন! দীপ্ত নয়ন যে তখন নাচায়!

শ্রীজগদম্বা দেবী।

ভৈরবী

সীমাহারা সিন্ধুনীল অম্বরের পশ্চিম বেলায়,
ও কা'র যোগিনীমূর্ত্তি রক্তাম্বর বিভূতি ভূষায়!
করে ল'য়ে 'শুক'তারাদীপ দাঁড়াইয়া প্রশান্ত মূরতি,—
ও কি মহীয়ান্ রূপ! খগকুল গাহে সন্ধ্যারতি!
তুমি দেবি! ধরিয়াছ দীপ সমুজ্জ্বল তারি শুভ্রালোকে,
অনন্ত সাগরযাত্রী গ্রহতারকাদি সৌরলোকে,
খুঁজি লয়ে নিয়ন্ত্রিত পথ নিজকক্ষে করিছে ভ্রমণ,—
নাহি কর্ম্মকলরোল অবিশ্রান্ত মৌন আবর্ত্তন!
—নিশিশেষে স্তিমিত প্রদীপ ; পূর্ব্বাকাশে জ্যোতিঃ সুপ্রকাশ
হেরি তব মহামূর্ত্তি! বর অঙ্গে শোভে রক্তবাস,
ধক্‌ধক্ রক্তনেত্র বিভূতি-ভূষিত শুভ্র ভালে,
দিগম্বরা কম্প্র অঙ্গে সচকিতা চতুশ্চক্রবালে!
স্বর্ণমুখ রক্ত শঙ্খ ফুৎকারিছ আরক্ত অধরে,
শঙ্খের স্পন্দন তুলি' সুপ্তোত্থিতা ধরার অন্তরে!
জ্যোতিঃ-পদ্ম পদতলে ঝলি', উঠে বিদারি আঁধার,
বিকীরিয়া লক্ষধারে রক্ত আভা বুকে নীলিমার!

হে ভৈরবি! তুমি সেই ব্রহ্মাণ্ডের আদিম সন্ধ্যায়,
সদ্যঃ সৃষ্ট গ্রহতারা যবে অন্ধকারে পথ নাহি পায়,
ওঠে বিশ্বে হাহাকার ভীতিরোল সর্ব্বচরাচরে—
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে, ঊর্দ্ধে তুলি বরাভয় করে
প্রদীপ্ত প্রদীপখানি, দাঁড়াইলে সিন্ধুর বেলায়,—
মুহূর্ত্তে জ্যোতিষ্করাজি গ্রহতারা পুনঃ পথ পায়!

সেই হ'তে ধ'রে আছ দীপ নির্ব্বিকারা মহাসিন্ধুতীরে,
ডম্বরু ধ্বনিয়া কাল নৃত্য করে পদযুগ ঘিরে!
তোমার ইঙ্গিতে দেবি! অনন্তের পথে বিশ্ব ধায়,
সংহার সৃষ্টির মাঝে অচঞ্চলা, নমি তব পায়!
জয়! জয়! ত্রিনয়নি! রক্তাম্বরা ভৈরবীরূপিণি!
সৌরকরকান্তিতনু জ্যোতিষ্কের মণ্ডলবর্ত্তিনি!

শ্রীনরেন্দ্রকুমার ঘোষ।

নারায়ণ

জয় নারায়ণ!—

যুগে যুগে এস তবু,
দেখা নাহি পাই কভু,
আমারি আঁধার ঘরে পড়ে না চরণ?—
নিতি ফুলে ভরি ডালা,
গাঁথি নব নব মালা,
থালায় ভরিয়া রাখি তুলসী চন্দন;
মনে ভাবি—দয়াময়,
আজি বুঝি দয়া হয়—
ভকতের উপহার করিবে গ্রহণ!—
কই তুমি কই এলে

বৈকুণ্ঠের জ্যোতিঃ ঢেলে,
কই সে পবিত্র বিভা বিশ্ব বিমোহন ?—
আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ধূলি,
তাই কি রহিবে ভুলি,
তোমার ব্রহ্মাণ্ডে যে গো আমি "একজন"—
তাই ত তোমার কাছে,
আমারও সে দাবী আছে,
লইবে আমার পূজা, সবারই মতন।
আমিও বিপত্তি তরি,
শ্রীমধুসূদনে স্মরি,
আমিও দুঃস্বপ্নে করি গোবিন্দে স্মরণ ;
আমিও, ও পদে হরি!
ভকতি প্রার্থনা করি,
আমিও অন্তিমে চাহি দেব নারায়ণ,
আমারে দেবে না কেন ও রাঙ্গা চরণ ?

শ্রীমানকুমারী বসু।

নিয়তির খেলা

[কথানাট্য]

প্রথম দৃশ্য।

[দামোদর নদের অনতিদূরে খণ্ডঘোষ গ্রামের সীমান্তে পল্লীগ্রাম। ভরা ভাদ্রমাসের সন্ধ্যা...আকাশ ঘোর মেঘে ছাইয়া আছে। কনার মা ঘরের দালানে বসিয়া প্রদীপের সলিতা পাকাইতেছিল। ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, জোর হাওয়ায় মাঝে মাঝে ঝড়ের মত বাতাস উড়িয়া চলিয়াছে, বৃষ্টির জোর ছাট্ দালানের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। কনার মা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া সরিয়া বসিয়া আবার সলিতা পাকাইতে বসিল। ভিজে হাওয়ায় আর জলে চারি-দিক যেন কেমন স্যাঁতাইয়া উঠিয়াছে...উঠানের চারিদিকে জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে...উচ্চিংড়েগুলা "কীরর্ কীরর্" করিয়া ডাকিতেছে। কনার মার চক্ষু জলে ভরা, এক হাত দিয়া একবার করিয়া চক্ষু মুছিতেছে, আবার সলিতা পাকাইতেছে...সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল...শৃগালগুলা চারিদিক হইতে ডাকিয়া উঠিল। মেঘের ঘন আঁধার যেন সমস্ত গ্রামের বুকে চাপিয়া বসিয়াছে...]

কনার মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) পোড়া অদেষ্টে কি শুখিয়ে মরা ছাড়া আর গতি নেই...কনা এখন' ফির্‌ল না কেন! ...(নিশ্বাস ফেলিয়া) মরতুম্...মরতুম্...পোড়া মেয়েটার জন্যে (উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিতে গেল...ভিজে দেশলাই জ্বলিতেই চায় না)...পোড়া মেয়ে যে বারণ কর্‌লে মানে না...দূর্ ছাই...আমার এ অন্ধকারই ভাল...

নানা অকল্যাণ হবে যে, (যদিবা দেশলাই জ্বলিল ত, প্রদীপে তৈল নাই...ঘরের কোণ হইতে তৈলের ভাঁড় লইয়া তাহা চাঁচিয়া কোন রকমে একটু ময়লা তৈল গড়াইয়া পড়িল, তাহাতেই প্রদীপ জ্বালিল)...সবই ফুরিয়ে আসে আমার দিন ত ফুরোয় না।...খোকা! খোকা! (অন্যমনস্ক হইয়া ডাকিল, পরক্ষণেই চমকিত ভাবে)... উঃ কি ভুল! সন্ধ্যে জ্বাললেই তার কথা মনে পড়ে, ঘরে আলো জ্বাল্লুম আর সেও চোখ্ বুজ্‌লে, উঃ...ছ'মাস হ'য়ে গেল...

(বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিয়া আলো হইয়া চারিদিক শব্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিল...কনা ভিজিতে ভিজিতে সেই বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিল)

কনার মা। পোড়ারমুখী একশবার যে বারণ কল্লুম, তা কথা যদি কাণে দিলে...ভিজে যে জুব্‌ড়ি হ'য়ে গেছিস্...আঃ পোড়াকপালী চুলগুলো নেঙ্‌ড়া...এই ভর-সন্ধ্যেবেলা—

(কনার মা তাড়াতাড়ি তাহার চুলগুলা নিঙড়াইয়া দিল)।

কনা। আর আমি কক্ষণ যাব না, কক্ষণ যাব না...শুঁড়ীখানার ধারে গিয়ে আমি বাবা বাবা বলে চেঁচিয়ে ডাক্‌লুম, তারা সব হো হো করে হেসে উঠ্‌ল...কত খারাপ কথা বল্‌লে, আর বাবাও তাদের সঙ্গে হেসে উঠ্‌ল...আমার নদীতে ডুবে মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে...মা বাবা কি বলে হাস্‌লে!

কনার মা। (চোখ মুছিতে মুছিতে)...আমার অদেষ্ট...তোর যেমন পোড়া কপাল, কোথায় বিয়ে হবে ভাল ঘর বর হবে... না একমুঠো পেটের ভাত দিতে...এম্‌নি আমার পোড়া কপাল...যেমন অদেষ্ট করে এসেছিস্...

কনার মা। অদেষ্ট কি মা, আমাদের বেলাই অদেষ্ট...যত রাজ্যের

দুঃখু কি আমাদের জন্যে ভগবান বোঝা বেঁধে রেখেছিল... ওই ত ওরা সব কেমন রয়েছে...

কনার মা। নে পর্...(একখানা গ্রন্থিদেওয়া ছেঁড়া কাপড় টানিয়া মেয়েকে পরাইল...কনা দেখিল, কনার মাও দেখিল, পার্শ্বের বাড়ীর দোতালার ঘরে আলো জ্বলিতেছে...প্রতিবেশীর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা খাইতে বসিয়া কলরব করিতেছে)...জানি নি, অদেষ্ট ছাড়া পথ নেই...দুঃখু পাই, তাই বলি...হ্যাঁ-লা কনা! তুই খাবি নি...

কনা। কি খাব...ভাত কোথা? তুই বুঝি আবার সোণা পিসীর বাড়ী থেকে ভাত চেয়ে এনেছিস...কক্ষণ খাব না...রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন লা...

কনার মা। আজ তিন দিন যে পেটে কিছু পড়ে নি...তা বুঝি মনে নেই...

কনা। না পড়ুক, কি দরকার...বল্‌ছি আয়, তুই আমার গলায় দড়ী ঝুলিয়ে দে, আমি তোর গলায় দড়ী ঝুলিয়ে দিই... আর তা হলে উপোস কর্‌তে হবে না, রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন মা...

কনার মা। যেমন বরাত করে এসেছিস...

কনা। বরাত আবার কি. করেই যদি এসেছি, যেমন করে এসেছি তেমনি করেই যাই, ত চল্‌না আমরা খেটে খাই, তাতে না হয় লোকে বল্‌বে ছোট লোক, তা বলুগ্‌গে বাপু...চল্ তার চেয়ে সোণা পিসীদের বাড়ী বাসন মেজে খাব, লোকে গরীব বল্‌বে এই ত।...তোর পায়ে পড়ি মা, আর চেয়ে খাস্‌নি...তোর পায়ে পড়ি মা...

কনার মা। আচ্ছা আজ ত খা...

কনা। না না, আর আমি ও চাওয়া-ভাত খাব না...মা খাব না... তোর পায়ে পড়ি মা...

কনার মা। তা আমার যে বড় খিধে পেয়েছে, তুই না খেলে আমি কি করে খাই...

কনা। মা তুই বড় দুষ্ট মা...চল্ তবে, কেন মা আমাদের এমন বরাত হল...বাবা কেন অমন হয়ে গেল...

কনার মা। কি করে জান্ব, খোকা মারা যাবার পর থেকে সেই কেমন হ'য়ে গেল, ব্যবসায় সব টাকা গেল, বাড়ী ঘর গেল...(নিশ্বাস ফেলিল)...তার ওপর এই দু'বছর কাজ-কম্ম নেই...বলে ওই জ্বালা...তাই মদ খেয়ে বেশ ভুলে থাকি...কিছু ভাবনা এলেই হরে কামার মদ দেয় আর খাই...

কনা। আর আমরা, আর তুই যে মা না খেয়ে, আমি না খেয়ে এম্নি হয়ে পড়ে থাকি, তাতে বুঝি কিছু হয় না...হরে কামার মদ দেয় আর খাই, আর আমরা কি খাই?...

(নেপথ্যে গোকুলদত্তের গলা-খাঁকারির শব্দ শোনা গেল।)

কনার মা। চুপ্ কর পোড়ারমুখী...

কনা। কেন চুপ্ করব, কক্ষণ চুপ্ করব না, রোজ রোজ, একি বল্না...(বাহিরে তখন কনার পিতা গোকুলদত্ত মাতাল অবস্থায় চীৎকার করিয়া গান করিতে করিতে আসিতেছিল...ঝড়ের দাপটে তখন গাছের ডাল মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙিতেছে...আর গোকুলদত্ত চীৎকার করিতেছিল—

হাঁচি পায় ত হাঁচে ভাল
কাশি এলে কাশে,
কয় না কথা তুলে মাথা
ও সে আমায় ভালবাসে—

বাতাস তখন ঝাউগাছের মাথায় শোঁ শোঁ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল)

গোকুল। (নেপথ্যে) হ্যাঁ ছো...দের্ তর্...শালার ঝাপটায় নেশা

ছুটিয়ে দিলে...দের্ ফুঃ...হাড়ে বাতাস লাগিয়ে দিলে...
(আবার চীৎকার করিয়া গাহিয়া উঠিল)

হাঁচি পায় ত' হাঁচে ভাল
কাশি এলে কাশে...

কনা। ওই শোন না, মাতাল হয়ে কি বক্‌ছে—
কনার মা। ওই আস্‌ছে চুপ্ কর বাপু, চুপ্ কর ..পোড়ারমুখি!
কনা। কেন চুপ্ কর্‌ব...
কনার মা। আঃ কি করিস্ কনা।

(গোকুলদত্ত উন্মত্তের মত ঘরে ঢুকিল...তাহার পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, চুলগুলা উস্কোখুস্কো, মুখে ফেনা উঠিতেছে...আর আপন মনে "হাহা হাহা" করিয়া হাসিতেছে, গোকুল ঘরে ঢুকিয়াই তাহার স্ত্রীকে তাড়না করিয়া উঠিল)

গোকুল। এই মাগি, এই, দে ভাত দে...শীগ্‌গীর দে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে, ভিজে যেন ক্যাঁতা হয়ে গেছি,...দেনা মাগি,... দে ভাত দে।
কনার মা। ভাত কোথা পাব...তুমি কি আজ পাঁচ দিন কিছু দিয়ে গেছ...দু'খানা থালা ছিল, তাই বেচে দু'দিন চলেছিল... তুমি ত কেবল মদই খাচ্ছ, আমরা যে বেঁচে আছি কি মরিছি, তার ত খবরই নেই...ভাত কোথা পাব... মেয়েটা ডাক্‌তে গেল, তাকে যাচ্ছেতাই গালাগালি কর্‌লে ...ভাত কোথা পাব। তোমার কি একটু আক্কেল হয় না...
গোকুল। তা আমি কি জানি; আমি কি দুনিয়ার কর্ত্তা...
কনার মা। তুমি না জান্‌লে কে জান্‌বে...আমার কে আছে—
গোকুল। চোপ্ মাগি, দে বল্‌ছি, দে শীগ্‌গীর দে...মিছে ব্যাজ ব্যাজ করিস্ নে...মৌতাতের সময় ভাটিয়ে আনলে

কনার মা। তুমি অমন ছোট লোকের মত হয়ে গেছ...কি হয়েছ...
তোমার একটুও কি দয়া ধম্মও নেই...

গোকুল। চোপ্ ফের্...না ধম্ম নেই...কই ? ভাত দিবি কি না বল্ ?
নেই বুঝি, যাক্ চুলোয় যাক্...ভাত নেই ত নেই...যাক্
চুলোয় যাক্। আমার আজ মদ চাই, কিছু পয়সা থাকে ত
দে...না সে অষ্টরম্ভা, কি আছে দে। তাই ত কিন্তু মদ চাই,
দে দে...ওই যে সেই ঝাঁপিটে না...ঠিক হয়েছে ওতে
যে কি ছিল...

কনার মা। ওগো কি সর্ব্বনাশ! ওগো ওযে লক্ষ্মীর ঝাঁপি!
(গোকুল ঝাঁপিটা তুলিয়া লইল)

গোকুল। দেত্তোর লক্ষ্মী...বেটীর প্যাঁচার ডানা পুড়ে গেছে
অনেক দিন...এবার হাড় কখানাও পোড়াব...দেত্তোর
লক্ষ্মী...

কনার মা। কর কি...কর কি...ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তোমার
পায়ে পড়ি, ছাড় ছাড় সব গিয়েছে...আর, আর
ওতে কিইবা আছে, কিছুই নেই, দাও, দাও ওটা রাখ
...(কনার মা সেই ঝাঁপি লইতে গেল)

কনা। বাবা, হাত মুখ ধোও, কাপড় ছাড়, ভাত এনে দিচ্ছি, ভাত
এনে দিচ্ছি।

গোকুল। দেত্তোর ভাত...ছাড়্ ছাড়্ (গোকুল ঝাঁপিটা নাড়িয়া
দেখিল) কই বাজ্‌ছে না যে, কই বাজে না যে...কিছু
নেই, কিছু নেই, আজ হয়ে এখন আসেনি, কোতা গেছে,
আমার মদ চাই, মদ চাই, বুঝেছিস্...

কনার মা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, রক্ষে কর, ওতে কিছুই নেই,
একটা সেকেলে মোহর ছিল, সেও তুমি নিয়ে গেছ...সব
গেছে, সব গেছে আর কেন অকল্যাণ কর, ওতে কিছু
নেই, রক্ষে কর, ওটা নিয়ো না।

গোকুল। চোপ্ ছেড়ে দে...ছেড়ে দে...আজ মদ চাই, হরে নেই ...মদ চাই...

(কনা ও কনার মা উভয়ে বাধা দিতে গিয়া, ঝাঁপিটা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল...গোকুল কন্যাকে এক ধাক্কা দিল...ধনুকের ছিলা ছিঁড়িয়া যাইলে যেমন ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তেমনি টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া কপাল ঠুকিয়া গেল)

কনা। ওমা ছেড়ে দে, ওমা ছেড়ে দে।

কনার মা। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি, সর্ব্বনাশ কোরো না—অকল্যাণ কোরো না...

গোকুল। ফের্ হারামজাদী, তবে দিবিনি, দিবিনি, দেস্তোর তবে যা, তুইও যা, তোর কালপ্যাঁচা লক্ষ্মীও যাক্—যা যা দূর হ...

(গোকুল কনার মার গলা টিপিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে সজোরে লাথি মারিল, কনার মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি বুকে করিয়া উপুড় হইয়া পড়িল)

...যা আমার মদ চাই···

(গোকুল যাইবার সময় বাঁ-পা খোঁড়ার মত ন্যাক্‌চাতে ন্যাক্‌চাতে পা টানিতে টানিতে বাহিরের দিকে গেল)

কনা। ও বাবা, আমরা যে আজ তিন দিন খাই নি...মা যে আজ তিন দিন খায় নি।

গোকুল। যা যা দেক্ করিস্ নি, খাস্‌নি ত খাস্‌নি... বেশ করেছিস্

(কনার মা ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল)

কনা। ওমা, মাগো, ওমা, মা, মা, বাবা! মা যে আজ তিনদিন খায় নি, কি কর্‌লে বাবা?...

গোকুল। খাস্‌নি তোরা খাস্‌নি...তিনি দিন খাস্‌নি...তা তা আমি কি জানি, আমি কি জানি, খাস্‌নি বেশ করেছিস... যাই আমি যাই...মদ চাই...

[মেঘের ধারা আরো জোরে বর্ষণ করিতে লাগিল, কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া একটা বাজ পড়িল...পৃথিবী যেন ওলট পালট হইতে লাগিল...গোকুল থতমত খাইয়া একবার দাঁড়াইল, তাহার পর পা টানিতে টানিতে চলিয়া গেল]

কনা। ওমা মাগো! (কাঁদিয়া উঠিল—একটা দমকা হাওয়ায় চাঁপা গাছের ডাল ভাঙিয়া উড়িয়া সেই ঘরের দ্বারের সামনে আসিয়া পড়িল...প্রদীপটা নিভিয়া গেল...চাঁপাফুলের গন্ধে ঘরটা ভরিয়া গেল...কনা তাহার মাকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল)

(রাত্রি অন্ধকার, মেঘে মেঘে ঘর্ষণের জন্য ঘোর রবে গর্জ্জন উঠিতেছে; কোথাও বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দু'একটা তারা ফুটিয়া উঠিল...মেঘ সরিয়া গেল...কৃষ্ণা চতুর্থীর নষ্টচন্দ্র দেখা দিল...তাহাব সেই আলোয় ঘরের ভিতরে মরণের হাসি জাগাইয়া দিল...দূরে নেপথ্যে গোকুল চীৎকার করিয়া গান করিতে করিতে যাইতেছে শোনা গেল...

খুঁজে তার পাইনে দেখা
কি হবে প্রাণ সজনি,
খুঁজে তার পাইনে দেখা—

পার্শ্বের বাড়ীর মাধব বোস, গোকুলদত্তের প্রতিবেশী ও বাড়ী-ওয়ালা, তাহার সঙ্গে মাণিক একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া গোকুল-দত্তের সেই বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল...মাধব বোস গোকুল-দত্তের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল)

মাধব। বলি কোথায় হে দত্তজা, ভাড়াটাড়া দেবে নাকি হে... ও দত্তজা! কই হে! কই রে, তোরা যে কেউ সাড়া-টাড়া দিস্‌নে, ও কনা! কনা! কোথায় রে! আরে এই যে সব চেঁচামেচি করছিলি, এখন যে আর রা করিস্‌নে

...আরে কোথায় গেলিরে...দেখ ত, কেউ আর সাড়াও দেয় না...

কনা। (ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) কে ?

মাধব। এতক্ষণ পরে কে! ওরে তোর বাবা কোথারে ?

কনা। বাবা ত নেই...(কনা আবার কাঁদিয়া উঠিল)...ওমা মাগো!

মাধব। এই যে ছিল, নেই ত আমার ভাড়ার কি করলে, তোর মাকে জিজ্ঞেস কর দিকিন্...এই যে পাঁচ মাস হয়ে গেল, একটা পয়সা দেবার নাম নেই...আজ রাত্তিরে যে দেবার কথা ছিল...রোজ রোজ ভাঁড়াভাঁড়ি, আজ নয় কাল... না দিতে পারিস্ ত উঠে যানা বাপু...রোজই এ এককথা ...ভাল লাগে না...আমার ভাড়া দিতে বল্...দেখ্ দিকিন্ মাণিক, এ রোজ রোজ কি ছাই ভাল লাগে...ভাল জ্বালা...

মাণিক। এজ্ঞে বোসজা মশায়, দেখব্ কি, ঘুটঘুটে অন্ধকার, দেখ্ছেন না সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পড়েনি।

(কনা ঘরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া উঠিল)

মাধব। তাই ত রে আলোটা এগিয়ে ধর দিকি...কাঁদে কে...

মাণিক। ধর্ব কি, ধরেই ত আছি...কিন্তু সে গুড়ে বালি, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত জ্বলেনি, ভাড়া দেবে হুঁ।

(মাণিক লণ্ঠনটা লইয়া ধরিল, মাধব বোস অগ্রসর হইয়া দেখিল)

মাধব। ওকিরে, ঘর অন্ধকার কেন, কি হয়েছেরে, কাঁদছিস্ কেন, ওকিরে তোর মা অমন করে পড়ে...একি মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে যে, কি হয়েছে ?

কনা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) কাকা আমার মা যে কি রকম কর্ছে কাকা ?

মাধব। বলিস কি রে এ্যাঁ...

(কনার মা হঠাৎ কাঁপিয়া বাঁকিয়া উঠিল, তাহার পর আর এক ঝলক রক্ত তুলিয়া মরিয়া গেল)

মাণিক। হয়েছে...ও বোসজা মশায় এ যে একেবারে যাত্রা শেষ এ্যাঁ...

মাধব। বলিস কি রে, সেই মিন্‌সে বুঝি মেরে গেছে...মরে গেছে নাকি...কি সর্ব্বনাশ! এযে হাতে দড়ী দেবার যোগাড়... অ্যাঁ...কি বিপত্তি...

মাণিক। এজ্ঞে তাই ত, এ যে উল্টো উৎপত্তি...

মাধব। অ্যাঁ এই গিন্নী বল্‌ছিল, গোকুল এসেছে মাগীর সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছে। ভাড়ার টাকা, নাঃ...মজালে দেখ্‌ছি, ওরে মাণিক; এখন উপায়?

মাণিক। এজ্ঞে তাহলে ভাড়া থাক্, লোক ডাকা যাক্।

মাধব। আরে লোক ডাক্‌বি কি রে আবাগের বেটা, আগে সকলকে ডাক্, সবাই এসে দেখুক, শেষ যখন পুলিসের হাঙ্গামায় পড়্‌তে হবে...

মাণিক। এজ্ঞে বলেন কি বোসজা মশায়, তবে আপনি ডাক্‌তে থাকুন, আমি না হয় দত্তজাকে দেখি—

মাধব। মর্ আঁটকুড়ীর বেটা, তাকে দেখ্‌বি কি, দেখছিস্ নি এ তারই এই কাজ...নাঃ আমারও যেমন গাঁজাখোর দিয়ে কোন কাজ হয়।

মাণিক। এজ্ঞে গাল দেন কেন, সে কথা ত আমিই বল্‌ছিলাম যে গরীবকে কেন টানেন, তায় এই সন্ধ্যে বেলা মৌতাতের পালা, হায় শিব-শঙ্কর! একি ঘটালে বাবা...

মাধব। তাই ত কি করা যায় অ্যাঁ, এ যে বিষম ফ্যাঁসাদ হে (চীৎকার করিয়া) ওরে ও গোবর্দ্ধন, ও নফ্‌রা, ও রসিক তোরা কে আছিস্, একবার শীগ্‌গীর এদিকে আয়, শীগ্‌গীর আয়, বড় বিপদ...

(নেপথ্যে..."বোসজার গলা না...কি হয়েছে বোসজা, কি হয়েছে" বলিয়া চীৎকার উঠিল...তাহার পর রসিক, নফর ও গোবর্দ্ধন "কি

হয়েছে, কি হয়েছে” বলিতে বলিতে ছুটিয়া সেইখানে আসিল।)

মাধব। এই ছাখ ভাই ; হাতে দড়ী দেবার যোগাড়, এই গোক্‌ল মাতাল তার মাগ্‌কে খুন করে পালিয়েছে...আমার মাথা, ভাড়া চাইতে এসে দেখি এই ব্যাপার, আমার ত হাত পা আসছে না ভাই ; উপায় ?

গোবর্দ্ধন। ও আমি অনেকদিনই জানি, গোক্‌ল একটা কাণ্ড করবেই।

নফর। আরে তাকে এই যে মাগের সঙ্গে বকাবকি কর্‌তে, শুনেছি...

মাধব। সেই ত হে এই মিন্‌সে চেঁচাচ্ছিল, গিন্নী বল্‌লে ভাড়ার টাকা...আর এসে দেখি এই কাণ্ড...নইলে এই দুর্য্যোগে... এখন কি করা যায় বল দেখি ভাই, ফাঁড়ীতে ত খবর দেওয়া উচিত ?

রসিক। খবর দিতে হবে বৈকি, খবর দিতে হবে না...যাও না হে একজন যাও না।

গোবর্দ্ধন। তাই ত কে যায়...

রসিক। বলি তুমিই না হয় যাও না ভাই !

গোবর্দ্ধন। আমি খোঁড়া ল্যাঙ্গড়া মানুষ আমাকে আর কেন দাদা...

রসিক। আরে এই ত দু'পা, বেশীত আর দূর নয়।

গোবর্দ্ধন। আরে তা হলেও মর্‌ছি পায়ের শূলুনিতে, শুধু যোসজার হাঁকডাকে উঠে এসেছি, বাম্‌নী আমায় কত বারণ কর্‌লে ...তুমিই নিজেই যাও না ভাই।

মাণিক। এজ্ঞে তা এ নিয়ে আর আপনারা কেজিয়ে কর্‌ছেন কেন, ফাঁড়ীতে খবর দেওয়া ত, অ্যা...তা সে আমিই যাচ্ছি...

মাধব। হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! মাণিক, যাওত বাবা লক্ষ্মীধন আমার...

মাণিক। এজ্ঞে এই গাল দিচ্ছিলেন, তা, তা এখন, তখন ভাল

লাগ্‌না, এখন মাণিক লক্ষ্মী সোণা, শেষ শালাদের হ্যাপায় পড়ে তুলোধোনা হই আর কি অ্যা...(মাণিক ফাঁড়ীতে খবর দিতে চলিয়া গেল)

(সুরেশ, নীরোদ, ও জনকয়েক প্রতিবেশী প্রবেশ করিল... তাহারা সকলে "কি ব্যাপার," "কি হয়েছে", "আরে এই যে তাকে দেখলুম" ইত্যাদি চেঁচামিচি ও গোলমাল করিতে লাগিল)

সুরেশ। কি ব্যাপার, কি ব্যাপার মাধব বাবু ?

রসিক। আঃ তুমি ছেলে মানুষ চুপ কর না হ্যা, তোমার অত খবরে কি কাজ।

নফর। আরে এই আমি দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে শুনছি মাগীর সঙ্গে চেঁচামিচি ক'রছে, তারপর সেও বেরুল তুমিও এলে...

মাধব। এই...এই...তবে ত তুমি সবই দেখেছ ভাই!···ওই যে দারোগা মশায় আসছেন!

(দারোগা দীনেশ দাস, পাহারালা চৌকীদার, জমাদার, ও পশ্চাতে মাণিক প্রভৃতির প্রবেশ)

মাণিক। (স্বগতঃ) ভ্যালা ঝামেলা বাধালে বাবা, এতক্ষণ শয়ে চড়িয়ে দেওয়া যেত, দিয়ে দিব্বি এক ছিলিম ভরপুর হ্যা...

দীনেশ। কি মাধববাবু ব্যাপার কি ?

মাধব। আর মশাই এই দেখুন, এক বেটা মাতালকে ভাঁড়াটে রেখে, দিন রাত্তির জ্বালাতনের একশেষ, আজ আবার তার নিজের মাগ্‌কে খুন করে এইমাত্র পালাচ্ছে...এই এঁরা পাঁচজন প্রতিবেশী এঁরা সকলে দেখেছেন।

দীনেশ। আপনারা মার্‌তে দেখেছেন ?

গোবর্দ্ধন। আমরা, আজ্ঞে হ্যাঁ...হ্যাঁ...তা এক রকম দেখাই বৈকি...

দীনেশ। দেখার আবার একরকম দুরকম কি, দেখেছেন কি না? কে কি দেখেছেন তাই বলুন।

মাধব। (জনান্তিকে) ওহে রসিক কেউ যে আর রা করে না...

মাণিক। (স্বগতঃ) নে বেটারা এখন ডিক্রী ডিস্‌মিস্ কর, যার ম'ল, আর যে গেল...হুঁ এখন কাক শকুনির ছেঁড়াছিঁড়ি, সৎকারটা হোত তা হোলেও বা...আর কেন বাবা...
(মাণিক নিঃশব্দে সরিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল)

দীনেশ। এ মেয়েটি বোসে কে?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে দারোগা মশায় ওটি সেই মাতালের মেয়ে, আর ওই যে লাস দেখছেন ওই ওর মা...

দীনেশ। বটে, এরি মা, আচ্ছা আপনাদের কথা পরে হবে, হ্যাগো মেয়ে তোমার বাবা কোথায়?

কন্যা। বাবা বাবা, অ্যাঁ বাবা ত নেই...

দীনেশ। নেই তাত জানি, তোমার মাকে মার্‌লে কে? বাবা? কখন চলে গেল?

কন্যা। না না বাবা, বাবা ত মারে নি, মা প'ড়ে মরে গেছে, তিন দিন খায়নি।

সুরেশ। (জনান্তিকে) উঃ! নীরো! নীরো! ভাই!

নীরো। (জনান্তিকে) চুপ কর, সুরো চুপ কর!

দীনেশ। তোমার মা আপনি পড়ে মরে গেছে?

মাধব। এই যে তোর বাবা চেঁচামিছি কর্‌ছিল...

কন্যা। না বাবা অনেকক্ষণ চলে গেছে, না...মার কাছে বাবা... নানা মার কাছে আমি ভাত চাইছিলুম, মা আমাকে বকে ভাত নেই বলে, গালাগালি দিয়ে তাড়া করে মার্‌তে আসে, তাই আমি মাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে রাগের মাথায় টিপে ধরে ছিলুম, তাই, তাই, মা মরে গেছে, ওই নখির ঝাঁপি নিয়ে মা তখন রাখ্‌তে যাচ্ছিল...

সুরেশ। না না, ওকি বল্‌ছ কনা! না না, আপনি ওর কথা শুনবেন না, ও বেচারী, ছেলেমানুষ মাথার বেঠিকে কি বল্‌তে কি বল্‌ছে...

দীনেশ। আঃ থামুন না মশায়, আমার কাণ আছে, আপনি নিজের মাথা ঠিক রাখুন। তা হলে তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করছ যে ঠেলে ফেলে দিয়ে টিপে মেরেছ?

কনা। অ্যাঁ...অ্যাঁ! হ্যাঁ আমি ঠেলে...

দীনেশ। তা হ'লে পড়বার সময় তোমার বাবা ছিলেন না...

কনা। অ্যাঁ, বাবা, অ্যাঁ তা খাবার জন্মে এসেছিল, না না—আমি...

দীনেশ। কি! কি! তোমার বাবাও ছিল...

কনা। বাবা!..বাবা! না...মাগো! কোথা গেলিগো! (কনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া তাহার মার বুকের উপর পড়িল)

সুরেশ। দেখ্‌ছেন...দেখ্‌ছেন...দারোগা মশায়, বেচারীর মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে, ও কি বল্‌বে...

দীনেশ। তা হতে পারে...মশায়েরও কতকটা সেই রকম দেখা যাচ্ছে, থাম্‌বেন বল্‌তে পারেন...

রসিক। তাই ত হে সুরেশ, তুমি কি মিছি মিছি বক্‌তে লেগেছ...

গোবর্দ্ধন। (স্বগতঃ) আহা, পিরীত এমনি বালাই...

মাণিক। (স্বগতঃ) হুঁ! বেঁচে থাক্ আমার শুখ্‌নো জটা, বাবা পিরীতের চেয়েও গাঁ্যাজা খেয়ে চটে যাওয়া ভাল...

দীনেশ। হুঁ! দেখ আমার কাছে ঠিক কথা বল, তোমার বাবা সে সময় ছিলেন কি না সত্যি বল—তোমার কোন ভয় নেই!

কনা। বাবা...বাবা...ছিল...বাবা—না...উঃ মাগো!

(কনা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া আবার তাহার মার বুকের উপর পড়িল)

দীনেশ। না দেখ্‌ছি, এর মধ্যে গলতি আছে, যাক্ এখন ত চালান

দেওয়া যাক্...(দারোগা দীনেশ দাস তাহার তদারক বহিতে কি লিখিল)

সুরেশ। (জনান্তিকে) ভাই নীরো! তুই ত সব জানিস্ ও যদি অমন করে যায় তবে আর আমি বাঁচব না...তুই যা হয় কর, বল, পাঁচ শ টাকা দেব...যা হয় করে ছেড়ে দিক্...

নীরোদ। দীনেশবাবু! একবার এদিকে অনুগ্রহ করে আসবেন কি, আপনার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা আছে...

দিনেশ। আমায় বল্‌ছেন? কি বলবেন, বলুন···

(দীনেশ দারোগা ও নীরোদের অন্তরালে গমন)

রসিক। ওহে রকম সুবিধের নয়, ছোঁড়াটার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে, সাধ করে পুলিশের খপ্পরে মাথা দিচ্ছে, ফুস্‌ফুসুনির মর্ম্ম বুঝ্‌ছ না...

মাধব। তাই ত, এই বেলা চট্ করে কেশব রায়কে খবর দেওয়া উচিত, পুলিশের ব্যাপার বল কি...মান্‌কে কোতা গেলি...

মাণিক। এই যে—মান্‌কে যেন চৌঘুড়ী জুতে রেখেছে হা...

রসিক। হুঁ! হুঁ! কাজটা ভাল দেখায় না, গোবর্দ্ধন তুমিই যাও ভাই, হাজার হোক্ পাড়াপড়্‌সী, আর আমরা উপস্থিত থাক্‌তে শেষ বল্‌বে খবরটা দিলে না...

গোবর্দ্ধন। তা সে আমি যাচ্ছি, তা সে আমি যাচ্ছি!

(গোবর্দ্ধন পা বাঁকাইতে বাঁকাইতে কেশব রায়কে ডাকিতে গেল)

দীনেশ। (ফিরিতে ফিরিতে)...না মশায় ও যখন নিজে মুখে স্বীকার যাচ্ছে তখন আমি কি করি বলুন···

নীরোদ। (জনান্তিকে) ওহে! ওযে বলে পাঁচ হাজার...

সুরেশ। দু' পাঁচ হাজার কোথায় পাব ভাই...কি হবে নীরো... দেখুন আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না...মিছি মিছি করে ও নির্দ্দোষী ছেলেমানুষকে গেরেপ্তার করবেন—তা হবে না— আপনি ওকে ছেড়ে দিন...

দীনেশ। তাকি হয় মশায়, আপনি বড় মানুষের ছেলে বলে আইন কি ছেড়ে কথা কইবে মশায়...তাতে খুনি মাম্‌লা... কবুলী আসামী কি বলেন মশায়...শিউশরণ হাতকড়ি লেয়াও...

শিউশরণ। যো হুকুম্...

সুরেশ। কক্ষণ হতে পারে না, আপনি এ অন্যায় কর্‌তে পারবেন না...কক্ষণ পারবেন না, আপনি পুলিশের লোক, আপনি মুখ দেখে মানুষের অন্তর বুঝতে পাচ্ছেন না...না কক্ষণ পারবেন না...(সুরেশ অগ্রসর হইয়া দীনেশ দারোগা ও শিউশরণ জমাদারকে বাধা দিল) প্রমাণ কি যে আপনি তাকে...না এ হতে পারে না...

নীরোদ। সুরো! সুরো...কি করিস...কি করিস...

মাণিক। যা হোক্ বাবা, না এও একরকম নেশা বটে, জমাটি আছে, জমাটি আছে (কেশব রায়কে সঙ্গে করিয়া গোবর্দ্ধনের পুনঃ প্রবেশ)

সুরেশ। আপনি পাবেন না নিয়ে যেতে, আমি থাক্‌তে...

মাণিক। উঁহুঁ! এই যে বেশ আটাকাঠি বেদে গেল, বাঃ চাঁদ, পিরীতের কি ফাঁদ বাবা!

কেশব। কি হ'য়েছে, কি হয়েছে দীনেশ বাবু...

দীনেশ। এই দেখুন্ না আপনার ছেলের পাগলামী...

সুরেশ। (দীনেশ দারোগাকে ঠেলিয়া) তবে দিন আমার হাতে হাতকড়ি আমি খুন করেছি, আমি সবারি সাম্‌নে স্বীকার কর্‌ছি, আমি খুন করিছি...আপনি নির্দ্দোষীকে গ্রেপ্তার কর্‌তে পাবেন না, কক্ষণ না...আমি খুন করেছি...

দীনেশ। আপনি খুন করেছেন?

সুরেশ। হ্যাঁ আমি খুন করেছি, গোকুলবাবু আমার বাবার টাকা ধারেন, সেই জন্যে তাগাদায় আস্‌তে হয়, আজও তাই

এসেছিলুম...এই নিয়ে অনেকদিন অনেক বচসা হয়, আজ আবার কটু ব'লে গিন্নী গাল দেওয়ায়, তাই রাগের মাথায় বেটক্করে ধাক্কা...

কনা। (সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল)···ওগো নাগো...আমি মেরেছি...

মাণিক। (স্বগতঃ) হুঁ, হুঁ, বাবা। একেই বলে সাঁচ্চা বাত্... প্রীত্ না মানে জাত কুজাত্...ধাক্কা বলে ধাক্কা...

দীনেশ। আপনি খুন করেছেন...

কেশব। মিথ্যে কথা, একেবারে মিথ্যে কথা—না না—হতভাগা লক্ষীছাড়া ছোঁড়া লজ্জা সরমের মাথা একেবারে খেয়েছ...

কনা। (স্বগতঃ) উঃ ভগবান! এ আবার কি?...ওগো নাগো, আমি মেরেছি, আমায় ধরে নিয়ে চল...

মাণিক। (স্বগতঃ) বাবা পিরীত কি রীত্...হিত করতে বিপরীত...

কেশব। ডাইনী ছুঁড়ী! ডাইনী ছুঁড়ী! মাথাটা একেবারেই খেয়েছে, বিয়ে দিইনি বলে—বিয়ে দিইনি বলে, জানেন দীনেশ বাবু, বুঝছেন না ছোঁড়াটার মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে, জোচ্চোর মাতাল বেটা, আমার টাকা ধার নিয়ে ফাঁকি দিলে, সব টাকা বাড়ীতেও আদায় হয়নি, জোচ্চোর! জোচ্চোর! ওদের ঝাড়ে বংশে জোচ্চোর...তার ওপরে ডাইনী ছুঁড়ী ছেলেটার মাথা এমন করে খেয়েছে অ্যাঁ··· শুনুন্ দীনেশ বাবু, নিয়ে যান ওই ছুঁড়ীটাকে ও যখন নিজের মুখেই কবুল দিচ্ছে, তখন আবার কি...লক্ষীছাড়া! হতভাগা...

সুরেশ। বাবা! আমি লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছি, তোমার লজ্জা হচ্ছেনা, এ বয়সে ধর্ম্মভয় হচ্ছেনা...দুনিয়া শুদ্ধু জোচ্চোর ...আর তুমি! ধিক তোমাকে, শুনুন দীনেশবাবু ও সব কিছু নয়, আপনি আপনার কাজ করুন...

নীরোদ। (জনান্তিকে) সুরো! সুরো! চুপ্‌ কর,...ও রকমে হবে না...

সুরেশ। (জনান্তিকে) তবে নিয়ে পালাই চল্‌...

নীরোদ। (জনান্তিক) তুই পাগল হয়েচিস্‌...

দীনেশ। (মুখ বিকৃতিসহকারে হাসিয়া) তাই ত এ দুতরফা এ রকম কবুল দিলে বড় মুস্কিলের কথা দাঁড়ায়...

কেশব। দোহাই দীনেশ বাবু, সত্যিই ছোঁড়ার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আপনি ওর কথা কিছু শুনবেন না, আমার কথা সত্যি মিথ্যে কিনা এই পাঁচজন প্রতিবেশীকেই...জিজ্ঞেস করুন...এ সকলেই ব্যাপারটা জানেন, কেমন হে গোবর্দ্ধনবাবু...কি বল বোসজা তোমাদের অজানত ত আর কিছু নেই...

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে হ্যাঁ দারোগা মশায় এ কথা ঠিক। এ ব্যাপার আমাদের সবারই জানা...শুধু ঝোঁকেতে পড়েই ছোঁড়াটা অমন করছে, ও ধর্‌বেন না ধর্‌বেন না!...

দীনেশ। তাই ত মশায় আপনারা পাঁচজন ভদ্দর লোকে বলছেন, আমিও না হয় তাই বুঝলুম,...কিন্তু আইনতঃ

কেশব। দোহাই দীনেশবাবু জোচ্চোর বেটা একেই আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তার ওপর আবার এই বজ্রাঘাত, দোহাই আপনার, আমি অনেক সময়, আপনার অনেক করেছি স্মরণ করে দেখুন...আমাকে এমন করে মজাবেন না...আর ও কথাই নয় বুঝ্‌তেই ত পাচ্ছেন, নইলে ছুঁড়ী স্বীকার কর্‌ছে তার ওপরে গায়ে পড়ে এসে বলতে যাবে কেন?

দীনেশ। আচ্ছা মশায়, আপনি গাঁয়ের একটা বর্দ্ধিষ্ট লোক, আপনার কথা ঠেল্‌তে পারিনি, বিশেষ এই পাঁচজন ভদ্দর লোকও যখন বল্‌ছেন, কিন্তু জানবেন পুলিশের কাছে কবুল দেওয়া, আর হাড়িকাটে গলা বাড়ান ও একই...যেমন

আপনাদের পাঁচজনের নাম, জবান্ রইল, তেমনি এও টুকে রাখ্‌তে বাধ্য হতে হল...এস মা তুমি আমার সঙ্গে এস, কোন ভয় নেই...কিন্তু স্মরণ রাখবেন...শিউ-শরণ! তোমলোক্ ইহাঁ লাস্‌কো তদ্‌বীর মে রহো...কিন্তু স্মরণ রাখবেন, আপনার ছেলে এ কবুল দিয়ে ভাল করলেন না।

কেশব। দোহাই দীনেশবাবু...

(দীনেশ দাস কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আগে আগে গেল, পিছনে কেশব রায় হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে চলিল)

সুরেশ। নীরো! নীরো! তুই ভাই সঙ্গে থাকিস্...আমি তাঁকে খুজ্‌তে চল্লুম...

নফর। ওহে বলি আমাদেরও যে নাম লিখে নিলে... শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াল দেখ্‌ছি...

গোবর্দ্ধন। মরুক্‌গে তাতে আর আমাদের কি করবে...ওই জন্যে বাবা পুলিশে খবর দিতে যাই নি...জানি বাবা বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা...

রসিক। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্ম গতি, কিন্তু দেখ ওই যে কালির আচড় টেনে সঙ্গে নিয়ে চল্‌ল, কেশব রায়ও এবার, বুঝলে কিনা...

১জন প্রতি। হওয়া চাই হওয়া চাই, গাঁয়ের অনেকের সর্ব্বনাশ করে এখন তেলক কেটে মহাবোষ্টম্...হবে না...

মাধব। যা বল দাদা, ভাড়া চাইতে এসে এই আমার কি বিপত্তি...

মাণিক। বোসজা মশার পত্যি রক্ষে হোলনা, ভাড়াটা ছেড়ে দিলেই হোত...ভাড়ার জন্তে তাড়া করে শেষ এই কাণ্ডটা বাধালে বাবা...

গোবর্দ্ধন। চল, চল, কেশব রায়ের মজাটা দেখা যাক্...

(সকলে প্রস্থান করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ভাঁটীখানার ভিতর...মাতালেরা চীৎকার করিতেছে, একদিকে শুঁড়ী মদ বেচিতেছে আর একদিকে সব মদের পিপে সাজান রহিয়াছে...অপর পার্শ্বে মাতালেরা গোলমাল করিতেছে...মধ্যে খানকয়েক বেঞ্চি, একখানা খালি তক্তাপোষ, তাহার ঠিক মাঝে একখানা টেবিল...মাতালেরা মদ খাইতেছে...হরে কামার ষষ্ঠী ও অন্যান্য মাতালেরা বসিয়া,...তাহাদের সম্মুখে মদের বোতল, একটা পাতায় কতকগুলা মাছ...ও একটা পাত্রে মদ ঢালা রহিয়াছে...]

হরে। (কোলের উপর একটা বাঁয়া রাখিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহাতে বাজ্‌নার তালের মত ঘা দিতেছে...আর বিকৃত স্বরে গান করিতেছে)...হ্যাঁ তেরে নাক্ ঢুমতা, আরে রাখ্ তোর ছেঁড়া কথা...ও মাতাল শালাদের কথা ছেড়েদে...ঢাল ঢাল, আমাদের ঢাল...কেন শালা খাবি গাল্ ঢাল, ঢাল, ঢাল্...আজ গোক্‌ল কোথায় গেল, উঁ না হলে জমেনা...ঢাল ঢাল্...

(নেপথ্যে গোকুল দত্ত গান গাইতে গাইতে আসিতেছিল—

খুঁজে তার পাইনে দেখা
কি হবে প্রাণ সজনি
পড়েছি বিষম ঠ্যাকায়
কি করি বলনা ধনি,
খুঁজে তার পাইনে দেখা—

গোকুল শুঁড়ীখানার ভিতর আসিয়া দেখিল টেবিলের উপর নানাবিধ খাদ্য ও মদের বোতল...গোকুল থমকাইয়া দাঁড়াইল... নিশ্বাস ফেলিল...আপন মনে বলিল, হুঁ তিন দিন খায়নি ..)

ষষ্ঠী। ঢাল্ ঢাল্...ওঃ কি মদই চোলাই করেছে বাবা, কলজে

দাবিয়ে দিলে...এই যে গোকুল তুই হাঁ করে কি ভাবছিস্...এই মদ খা, মদ খা, মদ খাবিনি...

হরে। তাক্ ভুম্ তা...এইযে গোকুল এসেছে বাঃ। বাঃ!...বসে যাও বাবা—বসে যাও, ঘনীভূত হয়ে বোস্...
(গোকুলের মুখের কাছে মদের পাত্রটা তুলিয়া ধরিল) মদ খাবিনি...

গোকুল। এই যে হরে...হরে...এই দে...দে...মদ খাবনা, খুব খাব (স্বগতঃ) হো! হো! জ্বল্‌ছে জ্বল্‌ছে...খুব খাব এই যে নে (পাত্রস্থিত সমুদয় মদ গলায় ঢালিয়া দিল) কই দে আবার ঢাল্,—সন্ধ্যে থেকে ভিজে যেন ক্যাঁতা হয়ে গেছি...উঃ! উঃ!...হুঁ ঢাল...ঢাল...হুঁ!

হরে। ...(বাঁয়ায় ঘা মারিয়া) গদ্দি ঘেড়ে নাক্—তোর মাথা কর্‌ব ডু ফাঁক্...বড় যে চুপ মেরে বসে আছিস...শালা, টাকা লাগেনি বটে...নে ঢাল...

ষষ্ঠী। না না এই ত...দের্...ফুঃ...

(সুর করিয়া গাহিতে লাগিল)

হরে কামারের টাকা
গোল গোল চাকা চাকা...

হরে। দিম্ তানা দেরে না...তুই শালা যে খাচ্ছিস্ না, (বাঁয়ায় ঘা দিয়া) মার শালার মাথায় চাঁটি মার চাঁটি তালাং...যে শালা না খায় মদ সে শালা গোলাম...দেরে তানা নানা অ্যাঁ... ওরে—

নাম ছিল তার সোণামণি
থাকত গাঁয়ের বাঁকে

এই গোকুল...এই...এই...করছিস্ কি...

গোকুল। (মদের পাত্র রাখিয়া বোতল শুদ্ধ গলায় ঢালিতে লাগিল)

...উহুঁ...আঃ আঃ জ্বল্‌ছে...জ্বল্‌ছে...আঃ বরফের মত, যেখান দিয়ে যায় হিম্ হিম্...

ষষ্ঠী। বলাইশার ভাঁটী বাবা, কি রকম চোলাই হুঁ...

হরে। এই গোকুল তুই কেবল মদ খাচ্ছিস্ (হরে কামার খাবার লইয়া গোকুলের মুখে গুঁজিয়া দিতেছিল...ও দিকে গোকুল "উঁহুঁ" "উঁহুঁ" করিয়া উঠিল...গোকুলের চোখের দুই কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল)...এই...এই... এই খানা—খা...

গোকুল। না না—মদ...

(শুঁড়ী তখন ঝন্ ঝন্ করিয়া টাকা ঢালিয়া গণিতেছিল... গোকুল টাকার আওয়াজে কাণ খাড়া করিয়া উঠিল...তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল)

হরে। তোর কি হয়েছে রে, তুই কাঁদচিস্...অ্যাঁ...আরে ছ্যা... মদ্দ মিনসে কিসের ডর,...আরে ছ্যা...খা—খা...

গোকুল। কিছু না...অ্যাঁ কই মদ দে, খাবার? না না খাবার না...মদ, মদ, মদ, উঁহুঁ (স্বগতঃ) অ্যাঁ খাসনি তোরা...অ্যাঁ তিন দিন খায়নি ওঃ...

হরে। তাক্ ঢুম্ দিন্ তানা দেরে না—হাঁ...জগঝম্প বাজাও বাবা জগঝম্প বাজাও...কিরে ফুরিয়ে গেল...ওহে বলাই... থোড়াই ভাব্‌না—আর এক বোতল্ আর এক বোতল্... এইনে টাকা—(হরে কামার টাকাটা ছুঁড়িয়া টেবিলের উপর দিল...টাকার শব্দে গোকুল চমকাইয়া উঠিল)... গোল ক'রনা...ঢাল্ ঢাল্ দেরে তানা—নানা অ্যাঁ... হাহা—

নাম ছিল তার সোণামণি
থাকত গাঁয়ের বাঁকে,

ঝন্ ঝন্ করে ফেলত টাকা

আর দিত যাকে তাকে...

তেরে নাক থুন্না...ধাধা ধুমাকেটে তান্না, দেনা শালা ঢাল না...

[শুঁড়ী তখন বাক্স বন্ধ করিয়া টাকা থলির মধ্যে পুরিয়া রাখিল...গোকুল তীব্র দৃষ্টিতে আড়ে আড়ে ঘাড় না ফিরাইয়া সেই টাকার থলির দিকে তাকাইতে লাগিল, তাহার পর চকিতের মত উঠিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল আবার বসিল...মনে মনে কহিল "টাকা ...টাকা"...]

হরে। ...ধা কেটে তাক্, তেরে কেটে তাক্-গদ্দিঘেনে ধা ; এই-এই তোর মাথা...হাঁ হাঁ ওরে...দিত যাকে তাকে

আমি দেখিনিক তাকে

আমি...শুধু পড়ে গেলাম ফাঁকে...হা-হা...ধা-ধা...

গোকুল। (উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল)...(স্বগতঃ)... টাকা ! টাকা ! টাকা ! অ্যাঁ খাস্‌নি তোরা,... খাস্‌নি তোরা (গোকুল চমকিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তাহার মাথার চুলগুলা খাড়া হইয়া উঠিল)

শুঁড়ী। ওহে সব ওঠ, ওঠ, আর নয় দোকান বন্ধ করব..ওঠ না হে, তোমরা ত আচ্ছা জটলা পাকিয়েছ, ও হরি...ভাই ...তোমরা—আরে রাত যে...ওঠ না ভাই

হরে। চল হে চল...জাল গুটোও, জালে মাছি পড়েছে—হে... এই গোকুল, ওরে নাম ছিল তার সোণামণি

থাকত গাঁয়ের বাঁকে

ধা ধা ধুমাকেটে...তেটে কেটে, চল, চল, পায়ে হেঁটে, এই ষষ্ঠে তুই শালা বেজায় বেঁটে...বেঁটে শালাদের ঝাড় বদমাইস্...

(মাতালেরা এক এক করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল, গোকুল ও তাহাদের সঙ্গে যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল...কি ভাবিল, ব্যাঘ্রের মত লোলুপ দৃষ্টিতে সেই টাকার থলির দিকে তাকাইতে লাগিল, তাহার বক্ষ থাকিয়া থাকিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, আর জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছিল)

গোকুল। (স্বগতঃ) যদি খেতে পেত, খেতে যদি পেত, খায়নি যে খায়নি যে ওঃ টাকা! টাকা! তিন দিন খায়নি... ওঃ ক্ষিদের জ্বালা, কিন্তু চুরি অ্যাঁ (গোকুল বুকে হাত দিয়া হাঁপাইতে লাগিল) অ্যাঁ...তা...তা...উঃ তিন দিন খায়নি...টাকা, টাকা! কিসের ভয়...অ্যাঁ...তবে চুরি ...চুরি...খায়নি যে, তখন, তখন...অ্যাঁ...তবে (গোকুল কাঁপিতে লাগিল)

[শুঁড়ী অন্যমনস্ক হইয়া গোকুলকে না দেখিয়া ভিতরের দিকে গিয়া দরজার নিকট হইতে ডাকিয়া কহিল, "ওরে ভাঁটীখানা বন্ধ করেছিস্"...এদিকে গোকুল সেই অবসরে টাকার থলি লইয়া দ্রুত সেই গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইল—ঠিক সেই সময়ে সুরেশ ছুটিতে ছুটিতে শুঁড়ীখানার দরজা দিয়া সেই গৃহে আসিয়া পড়িল]

সুরেশ। (ঘরে ঢুকিয়াই) কই কেউ ত নেই...কোথায় তবে তাঁকে পাই...(সুরেশ ফিরিয়া বলিতে গেল)

শুঁড়ী। (ফিরিয়া) চোর! চোর! চোর! পাহারালা...(সুরেশকে ধরিয়া) পালাবি কোথা শালা...

সুরেশ। এইয়ো, খবরদার চোর কি...(সুরেশ সেই শুঁড়ীকে সজোরে এক চড় মারিল)

শুঁড়ী। পাহারালা! পাহারালা! খুন কর্‌লে চোর! চোর! আমার কাল দাদনের টাকা আমার দাদনের টাকা... শালা...বল্ শালা কোথায় টাকা সরালি কথা কস্‌নি যে...(শুঁড়ীতে ও সুরেশেতে জাপ্‌টা-জাপ্‌টি হইতে

লাগিল...ওদিকে পাহারালা আসিয়া পড়িল...আরো অন্য লোক আসিয়া পড়িল)

পাহারা। আরে কেয়া হুয়া...

শুঁড়ী। চোর! চোর! পাহারালা সাহেব বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে পালাচ্ছিল...আরো কোথায় পালাল...শালা! আবার চড়...

১ লোক। ওহে ওযে কেশব রায়ের ছেলে, আঃ বাবা, বেটার বাপ বেটাও যেমন জালিয়াৎ এ বেটা আবার তেম্‌নি জাঁহাবাজ, চোর, বাবা! ডাকাতি—ডাকাতি...

২য়। বল কি বাক্স ভেঙে টাকা, অঁ্যা

(সুরেশ নিশ্বাস ফেলিল, তাহার চোখ দিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল)

পাহারা। আরে কেয়া ভদ্দর আদ্‌মি, কেয়া বাবু দারুকোবাস্তে এইসি হাল্, বহুত আচ্ছা থানে মে চলো সব্ ঠিক হো যাই।

সুরেশ। পাহারালা! এই বেইজ্জত করনা, চল আমি থানায় যাচ্ছি...

পাহারা। ওহি চল্‌না...হাঁ হাঁ ওহি চল্‌না...

২য় লোক। ওহে দেখেছ, আবার চোখে নোনা পানি ঝর্‌ছে...

সুরেশ। (স্বগতঃ) একি অদৃষ্ট! কনা! কনা!

তৃতীয় দৃশ্য।

[গোকুলদত্তের বাড়ীর দালানে একটা কেরোসিনের ডিপে জ্বলিতেছে...চারিদিকে অন্ধকার...ঘোর মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, মাঝে মাঝে গর্জ্জনে আকাশকে কাঁপাইয়া তুলিতেছে...একজন জমাদার ও রসিকের ভাই মাণিক বাসিয়া গাঁজা চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে কথা কহিতেছে ও মাণিক গান করিতেছে]

মাণিক। (গাঁজা চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে)

"এস গাঁজা আমার খাড়া

ও বাপধন

ছাগলে কামড়াল সীতে

মল রাজা দুর্য্যোধন...

হনুমানের মাথায় কিরে

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

রাবণে নিব্বংশ হোল

বালির পাতালে গমন !!

আঃ আবার ঝটুকির ঝাপ্‌টা আসে যে, একটু দাওয়ার মধ্যি উট্‌কে বস জমাদার সায়েব...

জমাদার। হাঁ হাঁ ঝড়্‌কা হাবা অব্‌তক্ চলত্ হোই...

মাণিক। আচ্ছা জমাদার সায়েব, এ খুনটা কে করলে বল্‌তে পার? তাইত খুনটা কর্‌লে কে...

হনুমানের মাথায় কিরে

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ...

(গাঁজা টিপিতে টিপিতে)

রাবণে নিব্বংশ হোল

বালির পাতালে গমন...

তাইত খুনটা কর্‌লে কে...

জমাদার। আরে খুন ভৈল খুন, কিস্‌সে ও হম্ কেয়া জানে, লেকিন্ আচ্ছা ভৈল, হামলোককা কুছ কামত্ মিল্‌না হোই...অউর বহ লেড়কিনে যব একরার কিয়া তব ওহিনে হোগা, কেয়া জানে ভাই, যব কই এয়সা কাম ন করে তব বাত কেয়সে হোই, কহত ভালা...

মাণিক। ঠিক জমাদার সায়েব, ঠিক বাত্...তবে কিনা

(গাঁজা কাটিতে কাটিতে)

"আকাশে উঠেছে চাঁদ
তৃণবৎ হোয়ে, হরবতী
গায় গুণ শ্যামের লাগিয়া
ভালা, তোর এত কথা কেন—

ঠিক, জমাদার সায়েব, ঠিক—

(তাড়াতাড়ি) তৃণবৎ হোয়ে, হরবতী
গায় গুণ শ্যামের লাগিয়ে
ভাল, তোর এত কথা কেন...
ভাল, তোর এত কথা কেন...

(গাঁজা সাজিয়া...তাহাতে জ্বলন্ত টিকা দিয়া) পিজিয়ে জমাদার সায়েব।

জমাদার। আরে তোম্...তোম্...

মাণিক। আরে নেই নেই...

জমাদার। আরে তুম্‌নে আচ্ছি আদ্‌মি হোই, ইয়ে ঠাণ্ডি মে ময়নে মর চুকা তুম্‌নে জান দেই...বহ বহুত আচ্ছি আদমি হোই...

(গাঁজা টানিয়া ধূম নির্গত করিতে করিতে) তরিবৎ.. তরিবৎ...

মাণিক। (কলিকা লইয়া ভিজা ন্যাকড়া জড়াইতে জড়াইতে পুনরায় সুর করিয়া)

আকাশে উড়েছে পাল
আর ড্যাঙায় চলে কল
ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু বসে
কর্‌লে বেদখল...
ভাল তোর এত কথা কেন...

...(ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া)...ওইত...তাইত জমাদার সায়েব, তাইত

ঠাণ্ডা দেখে তোমার কাছে এলাম, একলা দিল চলে না...কেমন কিনা জমাদার সায়েব...

জমাদার। হাঁ ভাই ঠিক..

[গোকুলদত্ত অন্ধকারে টাকার থলি বুকে করিয়া অতিদ্রুত দরজার কাছে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল, আপন মনে কহিল, "অ্যাঁ তবে সত্যি"। গোকুল দরজার পার্শ্ব হইতে সরিয়া অন্ধকারে লুকাইল]

মাণিক। জমাদার সায়েব ওখানটায় কিসের ছায়া পড়্‌ল না ? ওই যে কে যেন সরে গেল।

জমাদার। নেহি ও আঁধিয়ারামে—নেহি...ছিলাম চড়াও...হম ভোন-শোয়ালকি রহনেবালা হ্যায়...ডর কেয়া...

ভোনশোয়ালকি পানি
অওর কাবেরীকি গাঁজা
গয়াজীকো তামাকুল
যো পিয়ে ওহি মরদ কি রাজা।

মাণিক। আহা! জমাদার সায়েব...ও যেন প্রাণ একেবারে পটল ভাজা, কি মজা, কি মজা...জমাদার সায়েব! উহুঁ, ছায়া যেন ঘুর্‌ছে, ও কি রকম অ্যাঁ...

গোকুল। (অন্ধকারে লুকাইতে লুকাইতে) কেউ দেখেনি ত... ওই আবার কে আস্‌ছে না ? যাই...টাকা...টাকা...না না আর এখানে না (গোকুল একটা গাছের পাশ দিয়া ঘরের কানাচে সরিয়া দাঁড়াইতে গেল, অমনি একখানা চালের খোলা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহার উপর পা পড়িয়া খোলা মড়্‌ মড়্‌ করিয়া শব্দ হইল, গোকুল ভীষণ দৃষ্টিতে এদিকে চাহিয়া ঘরের কানাচের ধারে সেই চাঁপা-গাছের ভাঙা ডাল ঠেলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিল)।

মাণিক। রাম! রাম! রাম!

জমাদার। আরে কেয়া রাম রাম কহত হেই, বোল্ শঙ্কর, গাঁজা পিত হোই আউর...

মাণিক। তাই ত অ্যাঁ! কি যেন একটা মড়্ মড় আওয়াজ হ'ল না জমাদার সায়েব?

জমাদার। আরে কেয়া...ঝট্কা চলত্ হোই আউর কেয়া, ফিন্ চড়াও

গোকুল। তবে সত্যিই, ওই যে জমাদার রয়েছে, আর ওই বুঝি পড়ে—...আর কনা...নিয়ে গেছে...নিয়ে গেছে...অ্যাঁ তিন দিন খায়নি, তিন দিন খায়নি উঃ

(গোকুল ইতস্ততঃ তাকাইয়া ঘরের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিতে গেল...গাছের ডালটা ছাড়িয়া দিল, ডালটা সজোরে ছিট্কাইয়া খস্ খস্ করিয়া একটা শব্দ হইল)

মাণিক। উঁহুঁ ওই যে কি আওয়াজ হল জমাদার সায়েব, অ্যাঁ বেটী মরে পেত্নী হয়নি ত, শনিবারে ভর-সন্ধ্যে মরেছে...তার বাড়ীর কানাচে চাঁপাগাছ।

জমাদার। আরে কেয়া তোম্...ফিন্ চড়াও...কেয়া, আরে শঙ্করকা নাম জপত্ হোই অউর কা তুমহার...

মালা জপে শালা
করমে জপে ভাই
আর গাঁজা যে পিয়ে ভালা
ওহি ভকত্কো চাঁই...

অব দোঁহামে এহি গাতা হেই...ডর ক্যা...

(নেপথ্যে মাণিকের দাদা রসিক—"মান্কে", "মান্কে" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আসিতেছিল...পদশব্দ শুনিয়া...মাণিক আবার চমকাইয়া উঠিল)

মাণিক। ওই জমাদার সায়েব অ্যাঁ বলি নাম ধরে ডাকে যে—
অ্যাঁ রাম...রাম...ওই

(নেপথ্যে..."মান্‌কে", "মান্‌কে" "মান্‌কে")

রাম কহো তবে পেত্নী নয় দাদা...জমাদার সায়েব নাও
নাও ঝট্ করে আর একটান টেনে নাও...

(রসিক ডাকিতে ডাকিতে সেইখানে আসিল)

রসিক। আমি জানি হতভাগা ভবঘুরে, কোন্ চুলোয় যাবে...
ওরে ওই মান্‌কে খেতেটেতে হবে, না কি তোর জন্যে
ভাত নিয়ে বসে থাক্‌বে সাড়ে সাতজন আছে না...

মাণিক। হ্যাঁ এই যাচ্ছি দাদা, এই যাচ্ছি...

রসিক। হতভাগা, এই খুনে ব্যাপারে

মাণিক। দাদা, জমাদার সায়েবের সঙ্গে আমার অনেকদিনের আলাপ
পত্তর আছে, ভক্ত লোক, শ্মশানে দেখাশোনা আছে।

রসিক। (স্বগতঃ) তাই যাও...হুঁ শ্মশানেই যাও...হাড় জুড়োয়...

(গোকুল তখন তাড়াতাড়ি গাছের পাশ দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া
দ্রুত চলিয়া গেল, তাহার টাকা বাজিয়া উঠিল...দূরে একটা পেঁচা
বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল)

মাণিক। রাম, রাম, রাম...আবার ওই যে শব্দ অ্যাঁ . জমাদার
সায়েব নিশ্চয় পেত্নী ভুল্‌তে পারেনি .ভুল্‌তে পারেনি—

রসিক। তাই ত শব্দ কিসের

(একটা কুকুর বিকট চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিল)

জমাদার। আরে কেয়া আওয়াজ ত হোই, কেয়া...কেয়া...দেখত
ভালা

(সকলে তাড়াতাড়ি আলো লইয়া সেই দিকে যাইতে দমকা
হাওয়ায় দীপটা নিভিয়া গেল)

মাণিক। বস্ বাবা একদম্ ঘুট্ ঘুট্, ও বাবা এ আবার কি হোল,
ধর্‌লে...ধর্‌লে—আমি পেত্নী, কিছু করিনি...ধর্‌লে—ধর্‌লে

...দোহাই বাবা পেত্নীমণি আমি কিছু করিনি, আমি কিছু করিনি...

জমাদার। কেয়া মুস্কিল, আরে আলো বি বুত গিয়া, আরে, আরে... ভাই একঠো দিয়াশলাই ত ভালা...

রসিক। এই আমি আন্‌ছি, এই আনছি, জমাদার সায়েব আমি আন্‌ছি...

মানিক। ও বাবা পেত্নীমণি ও বাবা পেত্নী আমায় ধরুনি আমায় ধরুনি...আমি আর গাঁজা খাবুনি, ও বাবা পেত্নী আমি আর গাঁজা খাবুনি।

জমাদার আরে চিল্লাও মৎ চলো!

(সকলে গোলমাল করতে করিতে প্রস্থান করিল)

চতুর্থ দৃশ্য।

[নদীতীরে ভাঙ্গা বাড়ী, বৃহৎ প্রাসাদ তুল্য...চারিদিক ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বড় বড় অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ গৃহশীর্ষ ছাইয়া আছে। চারিদিক অন্ধকার, মেঘের কাল ছায়া মাঝে মাঝে নষ্টচন্দ্রের মেঘচ্ছায়াঘোর অস্পষ্ট আলোক থাকিয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ...ঝড়ের রাত, বাতাস তখনও থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে... চারিদিকেই ঝিঁঝিঁ ও উচ্চিঙড়ের রব...মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বায়ু শন্ শন্ করিয়া উঠিল...ভাঙ্গা বাড়ী ঝর্ ঝর্ করিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল...গোকুল দত্ত টাকার থলি দুই হাতে বুকের উপর চাপিয়া, নিঃশব্দে বন জঙ্গল ঠেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল...চারিদিক নিস্তব্ধ... গোকুলদত্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল]

গোকুল। রাখ্‌ব কোথায় ..রাখ্‌ব কোথায়, ভাড়া-করা কুঁড়ে ঘর ছিল, তাও নেই, যাদের জন্যে আনলুম্ তারাও নেই, টাকা! টাকা! তোর জন্যেই সব হারিয়েছি...এই বাস্তুভিটে, ইন্দ্র-ভবন আমার, তোরই জন্যে কেশব রায় ফাঁকি দিয়ে কেড়ে

নিয়েছে, সাত রাজার ধন বুকের মাণিক, খোকা, খোকা, তোরই জন্তে ওষুধ পথ্যি বিনে টাউরে মারা গেছে, আর গিন্নী! আমিই কি মারলুম, আমিই কি মারলুম্...সেও তোরই জন্তে, তবু তোকেই আবার আজ বুকে করে নিয়ে এসেছি...চুরি! চুরি করে নিয়ে এসেছি...চুপ্...কিসের শব্দ (গোকুল চমকাইয়া কাঁপিয়া উঠিল...তাহার পায়ের তলা হইতে ভাঙ্গা ইট সরিয়া গেল)...না, না, নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চম্‌কাচ্ছি...বারে! টাকা! টাকা! দেখি, দেখি, একবার...অনেক দিন দেখিনি, অনেক টাকা ...দেখি!...অ্যা তিন দিন খায়নি, তিন দিন খায়নি... না খেয়েই মল, না আমিই মারলুম, টাকা, টাকা অনেক টাকা, অ্যা দেখি...(গোকুল টাকার থলি খুলিতে গেল...ওদিকে তাহার মাথার উপর দিয়া একটা কাল-পেঁচা ডাকিয়া গেল) কেও!...ও কাল পেঁচা, চুপ্... তোর চেয়েও কালকে বুকে করে এনেছি চুপ্...দাঁড়াও দেখি! (গোকুল টাকার থলি খুলিতেই গোটা কয়েক টাকা পড়িয়া শব্দ হইল) এই, এই, চুপ্ (আবার পেঁচা ডাকিয়া উড়িয়া গেল)...খবরদার! ফের্...তোকে খুন করব...(ওদিকে সব টাকা ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল, গোকুল পা হড়কাইয়া সেই ভাঙ্গা ইটের স্তূপের হোঁচট খাইল)...এই! এই! আরে! আরে! চুপ্...চুপ্. যাঃ (সব টাকা পড়িয়া গেল ..গোকুল হতভম্ব হইয়া অন্ধকারে সামনে পিছনে উর্দ্ধে তাকাইল—নষ্টচন্দ্রের আলোকে দেখিল টাকাগুলা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, আর উর্দ্ধে আকাশে কালপাখার চাঁদের আলো ছাইয়া কাল পেঁচাটা তেমনি ডাকিয়া উড়িয়া যাইতেছে)...বড্ড শব্দ অ্যা নাঃ ...যা যা তবে ওই খানেই থাক্...আঃ বেঁচেছি...আর তোকে

নিয়ে কি হবে...সবই ত গেছে, তবে আর তোকে নিয়ে কি হবে...না না—কনা আছে কনা আছে...আমি ত এখুনি ফাঁড়িতে গিয়ে কবুল দেব...কিন্তু কনা ত থাকবে, আমায় পেলে কনাকে নিশ্চয় তারা ছেড়ে দেবে...যখন যাব চুপি চুপি তাকে বলে যাব...অনেক টাকা, অনেক টাকা, কিন্তু চুরি যে...চুরির টাকা...ফোঃ ও সব ধর্ম্মের বুজরুকি...নইলে আজ কেশব রায়ের এই অবস্থা, আর আমার এই দশা...স্বপ্নেও কাউকে ফাঁকি দিইনি, তাই এই ফোঃ ...ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যে, সব মিথ্যে (হঠাৎ মেঘে চাঁদ ঢাকিয়া ফেলিল, গোকুল টাকাগুলা সন্তর্পণে কুড়াইতে লাগিল, পিছনে বিদ্যুৎ চমকাইয়া আকাশ কড়্ কড়্ করিয়া উঠিল.. গোকুল থতমত খাইয়া চমকাইয়া উঠিল—নিজের বুকে হাত দিল) কে? ওঃ বুকের শব্দ...অ্যাঁ...ওঃ এখনও আমার ভয়......হাহা...হাহা...কিছু না সব মিথ্যে ...ওই ভাঙ্গা চোর-কুটুরীটার মধ্যে রেখে যাই...ওর খবর কেউ জানে না...ঠিক হয়েছে...ওইখানেই রেখে যাই, যাব যখন শেষ দেখা করে যা'ব, একবার ত দেখা করতে দেবে, তখন তাকে চুপি চুপি বলে যাব...যাই ওইখানেই রেখে যাই (গোকুল টাকার থলি বাঁধিয়া সেই চোরকুটরীর ভিতর রাখিতে গেল।...কিছুক্ষণের মধ্যেই গোকুল বাহির হইয়া আসিল, যেন নষ্টচন্দ্র তাহার মুখের উপর মড়ার হাসির মত হাসিতেছিল)...

বস্...আর কি...এই বার বলি...কনা.. কনা!

(গোকুল চলিয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য।

[গ্রামের পথ, উড়ো হাওয়ায় দু'একফোঁটা বৃষ্টির জলকণা উড়িয়া উড়িয়া ঝরিয়া পড়িতেছে...পথ সহরের দিক হইতে আসিয়া দামোদর নদের দিকে চলিয়া গেছে...চারিদিকে প্রকৃতি যেন নিঃসাড় হইয়া রহিয়াছে...সব যেন কেমন স্তম্ভিত অবস্থায় কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে। পথে দুই সারি বৃক্ষ, তাহাদের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না, সব যেন কেমন হইয়া আছে। মাঝে মাঝে তালবৃক্ষের শীর্ষে বসিয়া একটা শকুন তীব্র স্বরে খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া উঠিতেছে, আর দুই চারিটা দাঁড়কাক বিকৃত সুরে মরণকে ডাকিয়া তুলিতেছে...প্রকৃতি যেন বেদনাকে ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না.. বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন.. দূরে শোনা যাইতেছে—দামোদরে ডাক উঠিয়াছে...মাধব বোস, রসিক, গোবর্দ্ধন ও প্রতিবেশীদ্বয় প্রভৃতি কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে]

১ম প্রতিবেশী। হ্যাঁহে ছোঁড়াটা নাকি হাজতে গেছে ?

২য় প্রতিবেশী। হাজতে যায় চুরির মামলায়, তারপর শুনছি নাকি ম্যাজিষ্টারের কাছে আবার ও কবুল দিয়েছে, যে আমি খুন করেছি...

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা পিরীতের কারখানা যা হোক্...

মাধব। কিন্তু চুরির ব্যাপারটা কি বল দেখি।

রসিক। কে জানে ভাই ওটা একদম সাজস বলেই মনে হয়; ছোঁড়া গিছল গোকুলকে খুঁজতে, শুঁড়ীবেটা সে সময়ে কেউ কোথাও না থাকায় ওকে দেখে ওকেই চোর বলে ধরিয়ে দিয়েছে...

গোবর্দ্ধন। ভ্যালা যা হোক্ পিরীতকেও বলিহারী, আর অদেষ্টকেও বলিহারী—

মাধব। গোবরার ওই এক কথা।

গোবর্দ্ধন। তাত বল্‌বে বইকি দাদা, গোবরা বামনা সত্যি কথা বলে কিনা—কাযেই, ও সব তোমরা বোঝ না হে বোঝ না। ও কেশব রায়ের পুত ও এক কিমাকার কিম্ভূত; দেখ্‌লে বাবাটা ত বে দিলে না এই সুযোগ ..

রসিক। না না গোবরার ওই কেমন, দেখেছ বোসজা, কেবল ওই কথাই নিয়ে...

গোবর্দ্ধন। কাযেই দাদা গোবর্দ্ধন সত্যি বলে ব'লে গোবরা বামুন বজ্জাত, তা হবে তোমাদের শুদ্ধ্‌ মন, সব এখন শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, ওটা তুমি ভাল বুঝবে দাদা।

মাধব। আবার আর এক কাণ্ড...গোকুলও নাকি সেই রাত্রে ফাঁড়ীতে গিয়ে ওই কথা বলে ধরা দিয়েছে, তবে আমার মনে হয় ও কোনটাই টেঁকবে না...

রসিক। সে যাহোক ভাই, কিন্তু আমার একি জ্বালা বল দিকিনি ..

মাধব। তোমার আবার হোল কি...

রসিক। আরে ভাই, জান ত আমার ঘরের কথা, মান্‌কের জ্বালায় ত চিরটা কাল জ্বলে পুড়ে মলুম, ওটা লক্ষ্মীছাড়া গাঁজা খেয়েই গেল, বংশে বাতি দিতে কে...তা ত বেশ, আবাগের বেটা নীরোটাকে মানুষ করে.. ওই একটা ভাগ্‌নে আর ওকে নিয়েই গিন্নীর সংসার, সেটা ত পাগলের মত হয়ে গেছে, বলে সুরোকে যদি না বাঁচাতে পারি, তবে আমিও যাব...গিন্নী কেঁদে কেটে অস্থির, আর সেটা সেই থানা আর উকীল বাড়ী, আর বর্দ্ধমান সহরটা চষে বেড়াচ্ছে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই...বাপ মা মরা ছেলে হাজার হোক সেই আঁতুড় ঘর থেকে মানুষ করে ছোট বোনটা মরবার সময় গিন্নীর হাতে হাতে সঁপে দিয়ে যায়, তারপর এত বড় হোল একটা মায়া পড়ে যায় না বল দেখি, আমার এ এক কি...ছেলেবেলা থেকে দুটোতে একসঙ্গে খেলা-

ধুলো করে এসেছে এখনও এক দণ্ড দুটোতে তফাৎ থাকে না ..

মাধব। আচ্ছা ফাঁদে এই গোকুল ফেলেছে, ভাড়াটে রেখে কি ফৈজৎ...জানতুম গোকুল হোক্ অবস্থা খারাপ, বড় ঘরের ছেলে...

গোবর্দ্ধন। ওটা তোমার ভুল বোসজা, ও গোকুল চিরকালই উড়ন চণ্ডে, যখন দু' পয়সা ছিল, তখন একেবারে দান ধ্যান দুর্গোৎসব, হৈ হৈ—নইলে কেশব রায় যখন বাড়ীখানা ফাঁকি দে নিলে, সেত আর জানতে বাকী নেই, সে সময় যদি একবার হতভাগা তোমায় কি আমায় বল্‌ত...

মাধব। আরে বলে আর কি হত ?

গোবর্দ্ধন। দু' এক হাজারও ত পেত, এ যে বাবা ষোল কড়াই কানা...

মাধব। আরে না না—ও কেশব রায়ের সঙ্গে লাগা—জাননা, আমায় এক পাঁচিলে বাস কর্‌তে হয়...

রসিক। তা ঠিক বোস্‌জা, গোকুলের ছেলেটা যেদিন ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়, পোড়াবার খরচ নেই, রাত্তির তিনটের সময় আমার পরিবার কান্না শুনে ছুটে যায়, তবে তার ব্যবস্থা হয় ; ওই মান্‌কে আর নারোটাতে, সে হাঙ্গাম পোয়ায়, ও কেশব রায় বেটা এমন চশমখোর, চোখের চামড়া নেই হে, তার পরদিন সকাল বেলা বাড়া থেকে তাড়িয়ে দিলে, আহা ওর মাগ্‌টা সেই লক্ষ্মীর ঝাঁপি হাতে করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে গেল, তারপর সে কি অবস্থা, একখানা নেকড়া বুকে আর একখানা নেকড়া কোমরে জড়িয়ে আহা মাগী কি কষ্টটাই পেয়েছে, বড় ঘরের বউ হয়ে শেষ সেই লক্ষ্মীর ঝাঁপি বুকে করে, আঁকড়ে ধরে ম'ল, তবু মা লক্ষ্মীর দয়া হোল না, হারে অদৃষ্ট। আর পোড়ালে

কি না মুদ্দ ফরাসে, গিন্নী বলে, আর কাঁদে...আহা (রসিক চক্ষু মুছিল) ও ধম্মে সইবে না বোসজা ধম্মে সইবে না ...আমার ত' আর নেই যে...

(হঠাৎ দামোদর জলের ডাক বাড়িয়া উঠিল)

মাধব। ওহে এদিকে গতিক বড় ভাল নয়, নদের জল যে রকম ফেঁপে উঠেছে, এখন বান না ডাকলে বাঁচি

রসিক। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। কদিন হাওয়ার যে রকম জোর, ও যে দুর্য্যোগ চলেছে...অশ্চর্য্য নেই... (গলদঘর্ম্ম অবস্থায় নীরো ছুটিতে ছুটিতে সহরের পথ হইতে আসিতেছিল...তাহাকে দেখিয়া...) ওই দেখ্‌ছ বোস্‌জা ছোঁড়াটা কি রকম হয়ে গেছে, পাগলের মত বেড়াচ্ছে...

(নীরোদের প্রবেশ)

রসিক। হ্যাঁরে তুই কি এমনি করে...শেষ মারা যাবি...

নীরোদ। মামা ! সে দিন কি মনে নেই, সেই গোলাবাড়ী আগুনের ভেতর থেকে সুরো যখন বাঁচায়...তার এই বিপদ কি তোমার বিপদ নয় মামা...আর সে যদি যায় ত আমার বেঁচে লাভ...

রসিক। তা তা, আমি কি বারণ কর্‌ছি বাবা, তোর মামী ভাত নিয়ে বসে, দু' মুঠো খেয়ে যা হয় তা কর...

নীরোদ। খাবার সময় কোথা, আমায় আবার এখনি উকীলবাড়ী ছুট্‌তে হবে...আমি চল্লুম...

রসিক। ওরে খেয়ে যাস্‌ (নীরোদ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল...যাই-বার সময় বলিয়া গেল 'আচ্ছা')...

মাধব। না কেশব রায় গাঁ শুদ্ধু মজালে...

গোবর্দ্ধন। চুপ্‌ কর হে চুপ্‌ কর...ওই যে কি মান্‌কের সঙ্গে ফুসুর

ফুস্থুর করতে করতে আসছে, চল হে চল, আমরা সরে পড়ি...

রসিক। হুঁ ও মানুকে শক্ত ঘানি, নেশাই করুক আর যাই হোক্...

(সকলে চলিয়া গেল)

(কেশব রায় ও মাণিক কথা কহিতে কহিতে সহরের পথ ধরিয়া আসিতেছিল)...

কেশব রায়। মাণিক! বাবা! তুই মাতব্বর স্বাক্ষী, দেখিস্ বাবা, তোর ধম্ম তোর কাছে, তোকে বাবা আমি পাঁচ শ টাকা দেব...

মাণিক। আমার ধম্ম কি ওই পাঁচ শ টাকায় বাঁধা থাক্‌বে রায় মশায়...একি বাগনাপাড়ার দত্তবাড়ী...যে তালগাছ পর্য্যন্ত চচ্চড়ি রান্না হয়ে যাবে...ধম্ম বাঁধা রাখ্‌ব কি!

কেশব। আরে নানা সে কথা না—বলছিলুম, তোকে পাঁচ শ টাকা দিচ্চি তুই শুধু আর তোর খরচাও ত আছে...কাজকম্ম ত কিছু করিস নি...তাই বল্‌ছিলুম আমার এই...তা পাঁচ শ দিচ্ছি ..

মাণিক। পাঁচ শ তা—তাতে কত মন গাঁজা পাওয়া যায় রায় মশায়... ওই শ্যাম সায়ারের জল শুষে নিতে পারে বল্‌তে পারেন ...ভাতের ভাবনা ভাবিনে, আমার কেমন কদিন জলের ভাবনা হয়েছে, নদী ত চারপো হয়ে উঠেছে...ভাতের ভাবনা ভাবিনে, ও দাদা আছে রোজ চারটে করে গাঁজার পয়সা দেয়...তা কি জান রায় মশায়, ও দু'পয়সাতেই চলে...আর দুটো, তা হয় ছোলা ভাজা ঘুগ্‌নী দানা, না হয় খোঁড়া কাণা, বুঝ্‌লে কিনা রায় মশায়...

কেশব। তা দেখ আমি তোমায় পাঁচ শ টাকা দেব...তুমি শুধু বল্‌বে হে, যে আমি কিছুই জানি নি, আর আমার সাম্‌নে কিছু হয়ও নি, দেখিও নি...

মাণিক। এজ্ঞে তাঁত জানিইনি...সেই ত বলব, তা এরি জন্যে পাঁচ শ টাকা কেন রায় মশায়, এতে কার আন্তশ্রাদ্ধ হবে...ধর্ম্মের না আমার...

কেশব। আহা! তাই ত বলছিলুম হে, ধর্ম্মত আছেই, ধর্ম্মত আছেই, তবে কি জান বাবা, টাকাও ত চাই—তাই, বল্‌ছিলুম কি তুমি শুধু বলবে...

মাণিক। তা রায় মশায় সে ভাবনা নি, যা জানি তা বলব্‌নি, এ্কি কথা হোল...আরে অ্যাঃ...আমায় তেমন পাবেন নি—হুঁ ধর্ম্ম স্বাক্ষী করে...শিবশঙ্কর রাম কহো! সে হবেকনি রায় মশায়, মিথ্যা বল্‌তে পারবু নি...

কেশব। পারবু নি—আরে এর আর বলাবলি কিছুই নেই...এই ত বলা যে আমি কিছুই জানি নি...ধর্ম্ম কর্ম্ম রাখ্...

মাণিক। তা রায় মশায় কোন কর্ম্মই ত নেই...তার ওপর আর... ওকে ডাকাডাকি কেন—এ পারবু নি রায় মশায়...আমি কিছুই জানি নি...

কেশব। আঃ ভাল মুস্কিল...আরে না না, তাই...শুধু এই বল্‌বি—বলবে যে সুরেশ না, ওই গোকুল বেটাই এ কাজ করেছে, বুঝ্‌লি...জানিস্ ত বেটা লোকের টাকা ধার নিয়ে দেয় না...সব ফাঁকা, সব ফাঁকা, বেটার আগাগোড়াই ফাঁকা... ওরই ওই কাজ ও চুরিও ওরি কায...

মাণিক। সেকি রায় মশায়, আপনি বলছেন কি, গোকুলদত্ত ফাঁকীবাজ, বল্‌লে যে মাথায় পড়্‌বে বাজ, এখনও যে রাত দিন হচ্ছে...এ্যা এমন সাজসূটা সাজিয়ে বাজাই কি করে, যাক্‌গে মরুগ্‌গে, শাঁপি টানি কাঁসি বাজাই ও ছেঁড়া ল্যাটায় আমার কাজ কি ছাই...অত শত কথার ধার ধারিনে, যান রায় মশায় পাঁচ শ টাকায় গিন্নার দিব্বি ফাঁদী নত গড়িয়ে দিন্‌গে, এ গরীবের ওপর ফাঁদকাঠি কেন বাবা...দোটানায়

পড়ে শেষ যাই আর কি, তার চেয়ে বিবি গিন্নীর মুক্তর টানা হবে এখন—আর আপনিও চাঁদপানা হয়ে তাই দেখুন গে...

কেশব। দেখ্...আমি কেশব রায়, আমার কথা না শুন্‌লে ভিটে মাটি উচ্ছন্ন...

মাণিক। নাঃ রায় মশায়ের দেখ্‌ছি একেবারে মতিচ্ছন্ন হয়েছে, ধম্ম-টাকে একেবারে তন্ন তন্ন করে জাবদায় হিসেব করে দিয়েছেন, যান্ যান্ রায় মশায়..প্রচ্ছন্ন হোন্...প্রচ্ছন্ন হোন্...

কেশব। দোহাই বাবা, তোর হাতে ধরি, হাজার টাকা দিচ্ছি, দোহাই বাপ্

মাণিক। এই তো রায় মশায়, ওর নাম কি, আমায় বাবা বলুন তায় দুঃখু নেই, কিন্তু টাকা দিয়ে বাপপিতোমোর নাম ভোলাতে চান...এ আবার একটা কথা কি অ্যা যে শুন্‌ব...

কেশব। দেখ তুমি আমার কথা শুন্‌বে না...

মাণিক। যান্ যান্ রায় মশায়—বেলা হোলো গিন্নী ভাত বেড়ে বসে আছে, আমারও জিব শুকুচ্চে বাবা, ব্যাজর, ব্যাজর, ভাল লাগে না...

(মাণিক চলিয়া গেল)

(দীনেশ দাসের তাড়াতাড়ি প্রবেশ)

দীনেশ। রকম কি কেশববাবু, বেটা পাগল...

কেশব। মুস্কিল দীনেশবাবু, আমার যেমন বরাত বেটা গাঁজাখোর হয়ে হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রেহ্লাদ, পয়সা কব্‌লে বাগ মানে না, উল্টে মুখঝামটি দিয়ে আসে...

দীনেশ। ভাববেন্ না ভাববেন্ না...ও আপনার কম্ম নয়, ও এক টিপনিতে আমি সিধে করে নিতে পারব, এখন এদিকের কি কচ্ছেন বলুন দেখি...

কেশব। কি বলুন...বলুন আরো দু' হাজারও...

দীনেশ। বলেন কি মশায়, একি খেলা, আমি অমনি চেপে দিলুম—কাল জজ রায় দেবে, আপনার ছেলে ত গেছে, আর কি করব বলুন, অমন করে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কবুল দিলে,... দেখুন মশায়ের জন্যে আমি কি না করেছি, সেই প্রথম হাতে নাতে ধরে আমি এক কথায় আপনার মান রেখে ছেড়ে দিলুম, যাক্ একটা বড় মানুষের ছেলের ইজ্জৎ রাখা...শুঁড়া বেটাকে ভয় দেখিয়ে, টাকা কব্‌লে তা আমি আর কি কর্‌তে পারি...আপনার ছেলে নিজে গিয়ে কবুল দিলে—এখন আমার হাত ছাড়িয়ে গেছে... তবে...

কেশব। দোহাই দীনেশবাবু! হতভাগা ছেলে আমায় ধনে প্রাণে মজালে আমায় ধনে প্রাণে মারলে, তার গর্ভধারিণী আজ ক' দিন ওঠেনি জলস্পর্শ করেনি...(গালে মুখে চপেটা-ঘাত ও কপালে করাঘাত করিতে করিতে) তবে তবে কত চান, বলুন, এগার, বারো, পোনের তাই দেব...হায় হায় নিশ্চয় ফাঁসী দেবে, দোহাই দীনেশবাবু আমি সর্ব্বস্ব দিচ্ছি আমি সর্ব্বস্ব দিচ্ছি দীনেশবাবু ওই গোকুল বেটার দরুণ নদার ওপর বাড়ীখানা দিচ্ছি...সেই যেখানা নীলেম করে ডেকে নিয়েছিলুম...(কাঁদিতে কাঁদিতে) দোহাই দীনেশবাবু আমার ওই শিবরাত্তিরের সল্‌তে...দোহাই দীনেশবাবু...আমার সুরোকে বাঁচান...

দীনেশ। চুপ্ চুপ্ করেন কি, গাছেরও কাণ আছে, চুপ্...চুপ্... এমন সমজদার লোক হয়ে আপনি করেন কি, চুপ্ চুপ্ ...চলুন...চলুন...থানায় চলুন এ পরামর্শের জায়গা নয় —বড় শক্ত সমিস্যেয় ফেল্লেন,...বড় শক্ত সমিস্যেয় ফেল্লেন...চলুন দেখি কি কর্‌তে পারি...

কেশব। চলুন, চলুন, আহা আপনার ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্

(দীনেশ দাসের সঙ্গে কেশব রায়ের প্রস্থান)

(মাধব বোস, রসিক, গোবর্দ্ধন, মাণিক প্রভৃতির পুনঃ প্রবেশ)

রসিক। ওহে বোস্‌জা, বলি ব্যাপার বুঝ্‌লে ত, আবার দারোগার সঙ্গেও ফুস্তুর ফুস্তুর চলেছে...

মাধব। আমি ত ভাই তখনই বলেছিলুম, রসিকধন, টাকা বড় চিজ হে...

রসিক। জজ বুঝি কাল রায় দিচ্ছে...আহা! ও যেতে যার ভাঙা কপাল তারি ভাঙে—ও গোক্‌লই গেল...আহা নবীন দত্তের বংশটা লোপ হল...আহা সে বেচারা কলমী শাকের দাম মাথায় করে বাজারে বেচ্‌ত, শেষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি করে গেল, আর তার নাতিটে পথে পথে দাঁড়াল, শেষ খুনের দায়ে এমন হয়ে গেল হে, বড় দুখের কথা...গিন্নী শুনে চোখ মুছলে...আর ত টাকা নেই যে সব হবে... কে জানে কার পাপে কি হয়...আজ টাকা থাক্‌লে...

মাধব। সে কথা আর বল্‌তে, শুন্‌লে ত, তার বাড়ীখানা...হুঁ ...টাকায় সব হয়...

গোবর্দ্ধন। হুঁ, আমি গোবরা বাম্‌না ও খুব চিনি, আমার পিসীর অত টাকা ছিল, তাই আমায় গোবরা বামুন বলে... টাকায় সব হয়...

মাণিক। উঁহুঁ! টাকায় মাণিক লাল হয় না বাবা!...

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[অন্ধকার নির্জ্জন কারাগার, কারাকক্ষের ভিতরে গোকুল দত্ত, এধার ওধার পাদচারণ করিতেছে...বাহিরে লৌহ-দ্বারের সম্মুখে প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, তাহার অনতিদূরে একটা হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহার আলোকে প্রহরীর দীর্ঘছায়া

ভিত্তিগাত্রে পড়িয়াছে, প্রহরী নড়িতেছে, ছায়াটাও নড়িতেছে... রাত্রি শেষ...বাহিরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন...বাত্যাতাড়িত মেঘ মাঝে মাঝে সরিয়া যায় ও কচিৎ দু'একটা তারা ফুটিয়া উঠে, আবার মেঘে ঢাকা পড়ে ..]

গোকুল। (চক্ষু তীব্র, নাসিকা স্ফীত) ...কে? কে? মোক্ষদা, মোক্ষদা, মুকি, কে? ওই যে সরে যাস্ কেন, এ্যা সরে যাচ্ছ কেন...এই যে তুমি—তুমি বেঁচে আছ?...সবাই বলে তুমি মরেছ...তবে...তবে...আমি এ কোথায়? কনা—কনা —কনা—ওকি কি বল্ছ, আমি তোমায় মেরে ফেলেছি, তোমায়? তোমায়? তুমি মোক্ষদা—তুমি ত মিথ্যা বল্তে পার না—তুমি ত অবিশ্বাস আমায় কর্তে পার না...না— তুমি! তোমায় মেরে ফেলেছি; অ্যাঁ আমি...ওঃ তাই বটে তোমায় মেরে ফেলেছি, তাই বটে...তাই বটে...তিন দিন খায়নি—তিনদিন খায়নি...ওঃ হাড় পাঁজরা সব ধন্-ঝনে হয়ে ছিল, এক লাথিতে গুঁড়ো হয়ে গেছে, লক্ষ্মীর ঝাঁপি বুকে করে লক্ষ্মী চলে গেলে...ওঃ সইতে পার্লে না, মোক্ষদা, সইতে পার্লে না...তা এখানে...এখানে...তুমি সঙ্গে সঙ্গে ফির্ছ, ছায়া হয়েও ছায়ার পিছনে ফির্ছ...তুমি ছায়া— না—না...না না তুমি হাস্ছ—কি বল্ছ, তোমার পায়ের লাথিতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বুকে ধরে মরেছি সেই ত আমার সব—সেই ত—সেই ত, আমার সুখ"—তাতে তুমি সুখী— সুখে মরেছ—আর আমি...গলাটা নিঙড়ে সমস্ত শ্বাস রোধ করে ফেল্তে ইচ্ছে হচ্ছে (গোকুল নিজ গলদেশ টিপিয়া ধরিল)...কিছু না একটু জোরে, আর একটু জোরে, তা হলেই...না—না তুমি বারণ কর্ছ—মর্তে নেই? সে কি মর্তে নেই?...মার্তে আছে মর্তে নেই... না মরে কি মারা যায়...সাত বছর বয়সে অগ্নি স্বাক্ষী

করে হাতে ধরে এনে ছিলুম…ওঃ…ওকি তবু হাস্‌ছ, উপস-করা শুখনো ঠোঁটে অত হাসি, মাথায় একরাশ সিঁদুর পরে সেই বিয়ের রাত্তিরের মত দাঁড়ালে যে—অ্যাঁ আবার হাস্‌ছ—অ্যাঁ…ওঃ…না—না ও ছায়া—ছায়া…প্রেত-পুরী থেকে উঠে এসছ—না এইটেই প্রেতপুরী অ্যাঁ…এত অন্ধকারে…(তখন ভোর হইয়া আসিতেছিল…চারিদিকে কাকের রবে ও প্রভাতের কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল… লোহার গরাদের ভিতর দিয়া একটু আলোর উঁকি দেখা দিল) ওকি চলে যাচ্ছ, কাক ডা'কল আর চলে গেলে, থাকতে পার না, ওঃ তুমি এখন অন্ধকারের বটে, ঠিক্… আলোয় আর তোমায় দেখা হবে না—ওই যে…ওঃ… নিয়তি ! নিয়তি ! কে ভাঙলে—কে গড়্‌লে,…কে ভাঙলে —ওঃ সব মিলিয়ে গেল—মোক্ষদা…নেই…নেই…একি স্বপ্ন…সারা জীবনটাই এই স্বপ্ন …(এমন সময়ে প্রহরী দ্বারের নিকটে আসিয়া ঝন্ ঝন্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দে দ্বার খুলিল)

প্রহরী। চল হো—এই…আজ্ কাচেরী মে যানে হোগা…ওই নন্‌দিয়া ডাহর ফাঁসীমে লটকাই দেই…চল্ বে চল্…

(গোকুল দত্ত নিঃশব্দে বাহির হইয়া, বাহিরের খোলা আকাশ দেখিল—মেঘের ভিতর দিয়া আলোক ফুটিয়া উঠিতেছে—একটা পারাবত ভিজে হাওয়ায় পাখার শব্দ করিতে করিতে উড়িয়া গেল)

গোকুল। কনা…কনা…কনা ?

(প্রভাতের ভিজে বাতাসে গোকুল শৈত্য অনুভব করিল)… আঃ…

(প্রহরীর সঙ্গে চলিয়া গেল)

সপ্তম দৃশ্য।

[বিচারালয়ের বাহিরে গ্রামের দিকে পথ...ঝড়ের হাওয়ায় গর্জ্জন ও মেঘের ডাকে পথ কাঁপিয়া উঠিতেছে...ছুটিতে ছুটিতে নীরোদ আসিতেছিল...পশ্চাতে কেশব রায়...]

নীরোদ। রায় মশায়! রায় মশায়! খুরো কোথা গেল, অ্যাঁ, এই যে—

কেশব। আরে এই যে তোমার সঙ্গে এই দিকে আস্‌ছিল...দেখ আবার কি করে...

মাণিকের প্রবেশ

মাণিক। কি রায় মশায় বলেছিনু বাবা মিথ্যে কইতে পারবুনি কেমন এখন...শিবশঙ্কর জিতা রও বাবা হুঁ...ওই চাঁদের মতন ডবকা ছেলে খুন কর্‌তে পারে...যত বোকা ধোঁকায় মরে...

কেশব। হ্যাঁ বাবা! হ্যাঁ বাবা! তোমার...তোর ভাল হোক্‌, বাড়বাড়ন্ত হোক্‌, হ্যাঁরে সে কোন্‌ দিকে গেল?

মাণিক। কেন এই যে তাকে দেখলুম, ওই বটগাছটার তলায়, ওই যে গোকুলদত্ত আর তার মেয়েকে নিয়ে ওই পথে গেল না...

(দূরে দামোদরের জলের ডাক হোহো শব্দে বাড়িতেছিল)

নীরোদ। চলুন একবার ওই দিকে যাই...ছোট মামা, তুমি একবার ওদের দেখ, চলুন রায় মশায়...

মাণিক। রায় মশায় বলি তখন ত খুব বাবা কালী—মা তারকনাথ করে নেশায় ঝাঁকি মারছিলে...এখন কলা মুলোটা যা হয় পূজোটা

না মান্‌ব ঠাকুর দেব না

আমার পিত্যেশ কর না

আছে একটি বেরাল ছানা...

কেশব। না—না—এই যে চল...চল্...

(নীরোদ ও কেশব রায়ের প্রস্থান)

(দীনেশ দারোগার প্রবেশ)

দীনেশ। ড্যাম ইড...সাজা হোল না, সাজা হোল না, নো conviction, no promotion...এমন করে হাতে নাতে ধরা খুন...

মাণিক। বলি ওকি হুজুর...আপনিই যে মুখ বিকৃতি করছেন...হা শিবশঙ্কর, পোড়া উদর নিয়ে বড় জ্বালা, ভরেও ভরেনা ভরেও ভরেনা (স্বগতঃ) বাবা এক একটা...জ্যান্ত কসাই ...ওকি! ওদিকে দামোদর যে ফেনা মাথায় করে আস্ছে (মাণিক অগ্রসর হইল, দারোগা আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল)

(তিনজন জুরীর প্রবেশ)

১ম জুরী। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন, দেখুন দেখি ছোঁড়ার একবারে কি মাথা খারাপ...বলে কিনা আমি খুন করেছি ...ভাগ্যিস আপনি আমায় ওটা বুঝিয়ে দিলেন।

২য় জুরী। তাই ত ওটা আগে বোঝাই যায়নি...ওই যে মাণিকের স্বাক্ষীতেই পুলিশের সব কারচুপি ফেঁসে গেল...তিন তিন্-টেতে কি ঝুলঝুলি এ বলে আমি মর্‌ব, ও বলে আমি মর্‌ব...

৩য় জুরী। ও লোকটাও বড় হতভাগা, আমি ওকে চিনি...আহা বেচারা...বিষয় আশয় গিয়ে লোকটার স্ত্রীর মৃত্যুতে মাথা খারাপ হয়ে মরবার জন্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছিল!...

(সকলে গোলমাল করিতে করিতে প্রস্থান করিল)

(গোকুলদত্ত ও তাহার কন্যা কনার হাত ধরিয়া সেইখান দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে...)

গোকুল। (স্বগতঃ) বেকসুর খালাস—ধর্ম্ম একি কর্‌লে...ঠিক্ ঠিক্

ধম্ম নেই...ধম্ম নেই...এই পথ দিয়ে চল মা এই পথ দিয়ে...
সেই গুলো আছে...

(কনা ধীরে ধীরে অবশ ভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে পিতার সঙ্গে চলিয়া যাইতে লাগিল)

অষ্টম দৃশ্য।

[গ্রামের প্রান্তভাগ, অদূরে দামোদর নদ বর্ষায় স্ফীত হইয়া দুলিতেছে...চারিদিকেই মেঘের ঘোর ছায়া...মেঘের ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্য মাঝে মাঝে রক্তময় আভা ছড়াইয়া আবার মেঘের ভিতর নিজেকে ঢাকিয়া লইতেছে...জলের কল্লোল, তটকূল ভাঙিবার জন্য নাচিয়া নাচিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। গোকুল দত্ত তাহার কন্যা কনার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে আসিতেছিল, উর্দ্ধে উর্দ্ধে কতকগুলা শকুন উড়িয়া যাইতেছে]

গোকুল। আর একটুখানি...আর একটুখানি চল্ মা, ওই গাছ-তলাটায় বসে একটু জল খেয়ে নিবি...বড্ড কষ্ট হচ্ছে! বড্ড কষ্ট হচ্ছে! অ্যাঁ এ কদিন বুঝি মোটেই কিছু খাস্‌নি—কিচ্ছু খাস্‌নি ?

কনা। বাবা...

গোকুল। মা মা, এই সন্দেশ দুটো খা দিকিন্—খেয়ে একটু জল খা

(কনার মুখে গোকুল সেই খাবার তুলিয়া ধরিল, কনা খাবার মুখে লইয়া হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল...কাঁপিয়া গোকুল দত্তের কোলে ঢলিয়া পড়িল...তাহার মুখের খাবার ঠোঁটের ফাঁক হইতে পড়িয়া গেল...কনা চক্ষু উল্টাইয়া নিশ্বাস ফেলিল)

গোকুল। কি হোল, কি হোল...কনা...কনা...মা—মা...ওঃ...ওঃ মুখে তুল্‌তে তুল্‌তেই প্রাণটা বার করে দিলি...অ্যাঁ...ও, হো! হো! হো! ওঃ! ঠিক্ চুরির টাকা দিয়ে কেনা খাবার

থাবি কেন...ঠিক্...ঠিক্...এতক্ষণে বিচারের পাতা খুল্লো দেখ্‌ছি ঠিক্...মা—মা—মা...একি কর্‌লি, একি কর্‌লি... নেই...নেই...মা নেই...অ্যাঁ সত্যি সত্যি নেই...ঠিক্... ঠিক্...মা মা...

(ছুটিতে ছুটিতে সুরেশ সেইখানে আসিল)

সুরেশ। এই যে আপনি এখানে...

গোকুল। কে...হুঁ...এসেছ...ঠিক্...ঠিক্...মা নেই...নেই...নেই... মা নেই...

সুরেশ। অ্যাঁ সেকি—না না বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়ে থাকবে...একটু জলের ছিটে দিয়ে দেখুন দেখি...আপনি মাথাটা একটু তুলে ধরুন...আমি দিচ্ছি...এই যে...

গোকুল। উঁহুঁ! চুপ্...চুপ্...বেশ ঘুমুচ্ছে, বেশ ঘুমুচ্ছে...তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি বুঝবে, বেশ ঘুমুচ্ছে...বেশ ঘুমুচ্ছে ...ঠিক্ ঠিক্...নেই...নেই...মা নেই...

সুরেশ। বলেন কি অ্যাঁ...ওঃ...

গোকুল। চুপ্ চুপ্ বেশ ঘুমুচ্ছে, বেশ ঘুমুচ্ছে, আর খেতে চাইবে না ..আর খেতে চাইবে না...মা—মা...না না...চুপ্ বেশ ঘুমুচ্ছে, বেশ ঘুমুচ্ছে...

[দামোদর তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে...সমস্ত প্রকৃতি যেন ভীষণ তাণ্ডব নর্ত্তনে দুলিয়া উঠিতেছে...দূরে ভয়ানক কোলাহল উঠিল...'পালা' 'পালা'...চীৎকার শোনা যাইতে লাগিল, সমস্ত গ্রাম যেন প্রলয়ের আর্ত্তনাদে পূরিত হইয়া উঠিল...দেখা গেল সেই বৃক্ষ-তলের নিকট দিয়া গ্রামবাসীরা পলায়ন করিতেছে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক... প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে...শশব্যস্তে কতকগুলি গ্রামবাসী সেই পথে আসিল...তাহাদের সঙ্গে মাণিকও পালাইতেছে]

১ম গ্রা। পালাও...পালাও...দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছ...বান এয়েছে, বান এয়েছে, সব ভেসে গেল, সব ভেসে গেল...পালাও

...পালাও...একে...এযে গোকুলদত্ত...আর সেই মেয়েটা...

মাণিক। বাবা...নদীর কূলে বাস...ভাবনা বারমাস...আরে একি অ্যাঁ...এই যে কাজের খতম্ বাস্...

২য় গ্রা। আরে চল চল্ কি করে, ওই এলো এলো...পালাও...পালাও...সব ভেসে গেল···

মাণিক। তাই ত ইস্...চল বাবা চল...দিশে পাইনে যে অ্যাঁ...বাবা শিবশঙ্কর খাবি খাইয়ে মেরনি বাবা খাবি খাইয়ে মেরনি...

(সকলে গোলমাল করিতে করিতে চলিয়া গেল)

সুরেশ। একি! হঠাৎ এমন বান, এই দিকেই যে আস্‌ছে...

গোকুল। কি! কি! বান এয়েছে, হাহা হাহা, ঠিক্ ঠিক্...আয়, আয়, বিশ্বসংসার চূরমার্ করে ভেঙে নিয়ে আয়্, কিছু রাখিস্‌নি, কিছু রাখিস্‌নি, সব ধুয়ে পুঁছে নিয়ে চলে আয়... ঠিক্...ঠিক্...মা নেই ..মা নেই...

সুরেশ। অ্যাঁ...না-না আপনি কি বল্‌ছেন, আছে, আছে, আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না কিন্তু এখুনি বানের মুখে পড়্‌লে, সব শেষ হয়ে যাবে, এখান থেকে সরে যাই চলুন, সরে যাই চলুন...

গোকুল। আয়! আয়! ওই আসছে! ওই আসছে! হাহা, হাহা... কিন্তু, অমন করে নয় অমন করে নয়···আমি যে পার্‌চিনি, আমার যে অত গলা নেই...অমন করে নয়...বাজের ডাকে চলে আয়, বাজের ডাকে চলে আয়, আকাশ ফেড়ে, পৃথিবী ডুবিয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে আয়, হাহা হাহা— মা নেই...মা নেই...আয়, আয়, এই এসেছে, এই এসেছে...হাহা—হাহা...ডাক্ ডাক্ চূরমার করে দে, হাহা ...হাহা...

সুরেশ। কি সর্ব্বনাশ, এল, এল যে, দিন দিন, আমায় দিন, আপনি পারবেন না আমায় দিন, আমার কাছে দিন...

গোকুল। অ্যাঁ নেবে, নেবে, তা নাও, তুমি কেশব, নানা.. আমার মা, আমার মা···

সুরেশ। করেন কি, করেন কি...এখনও এধারে আসুন, আমার কাছে দিন, আমার কাছে দিন,...যা সর্ব্বনাশ হ'ল...

(বন্যার উৎক্ষিপ্ত প্রমত্ত জলরাশি গর্জ্জিয়া তরঙ্গ তুলিয়া ফেনা মুখে করিয়া আসিয়া পড়িল...হলহলার ও জলের তরঙ্গে গোকুল দত্ত ও তাহার কন্যা কনাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল, গোকুল দত্ত তাহার কন্যাকে লইয়া ভাসিতে লাগিল...সুরেশও 'যা সর্ব্বনাশ হল' বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল)

গোকুল। (ভাসিতে ভাসিতে) না না আমার মা, আমার মা (উভয়ে কন্যাকে লইয়া জলের তাড়নায় হাঁফাইতে হাঁফাইতে, একবার করিয়া ভাসিয়া উঠে আবার ডুবিয়া যাইতে লাগিল, গোকুল আর একবার "হাহা, হাহা, হাহা" করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল)

(কেশব রায় ও নীরোদ ছুটিতে ছুটিতে আসিল)

কেশব। সুরো! সুরো! ওরে কি কর্‌লি, ওরে কি কর্‌লি...

নীরোদ। সুরো! সুরো! ভাই! ভাই!

সুরেশ। (ডুবিতে ডুবিতে মাথা তুলিয়া) কে নীরো! ভাই চল্লুম! অদৃষ্টলিপি! চল্লুম!

নীরোদ। সুরো! সুরো! তা হ'লে আমি কি নিয়ে থাক্‌ব ভাই, সেখান থেকে বাঁচিয়ে এনে শেষ এই বানের জলে, না তা কখনই হবে না, কখনই হবে না...রায় মশায়! রায় মশায়! আমি যেমন করে পারি সুরোকে ফিরিয়ে আন্‌ব, আপনি লোক ডাকুন...লোক ডাকুন...

(নীরোদও বানের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইতে লাগিল)

কেশব। এ্যাঁ লোক কোথা পাব, লোক কোথা পাব এ্যাঁ...

সুরেশ। নীরো! নীরো! ফিরে যা, ফিরে যা, আর না, ফিরে যা...

কেশব। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! অঁ্যা! কোথায় লোক, কোথায় লোক, কাকে ডাকব, কাকে ডাকব, ওরে কি করলি কি করলি, সুরো! সুরো! ওরে সর্ব্বস্ব খুয়েছি, সর্ব্বস্ব খুয়েছি, কি করলি সুরো...সুরো

(কেশব রায় দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া উন্মত্তের মত হইয়া উঠিল)

সুরেশ। কে বাবা...টাকা...টাকা...আমি না...আমি না...

কেশব। (মাথার চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে) হায়, হায়, হায়...হায়, হায়, হায়, টাকা না, টাকা না...সুরো...সুরো...

(আর একবার জলের ধাক্কায় তাহারা ভাসিয়া গেল, গোকুল কন্যা লইয়া রাখিতে পারিল না, সুরেশ কন্যাকে বুকে করিয়া ডুবিয়া গেল...গোকুল আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল..)

গোকুল। হাহা হাহা ..মা নেই...মা নেই...বাঃ বাঃ প্রলয় দুল্‌ছে, প্রলয় দুল্‌ছে—হাহা হাহা...

[আর একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া তাহাদের কোথায় লইয়া গেল...চারিদিকে তখন অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিয়াছে, উন্মাদ প্রকৃতি তাণ্ডব নৃত্যে নাচিয়া জলের কলহলার সঙ্গে ধ্বংসের উন্মাদ হাহা গীতি গাহিতেছিল শুধু সেই অন্ধকারে কেশব রায় পলকবিহীন নেত্রে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

যবনিকা পতন।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

রাধামাধবোদয়

[২]

প্রথম মিলন।

রাধামাধবোদয়ের তৃতীয় উল্লাসের নাম 'শ্রীরাধামাধব প্রথম দর্শন'। এই অঙ্কে পৌর্ণমাসীর কৌশলে সূর্য্যদেবের পূজা করিতে গিয়া রাধিকা সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণের দর্শন পান। শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সঙ্গে বনে ভ্রমণ করিতে-ছেন, কিন্তু তিনি আজ বড় অন্যমনস্ক। হাতে বাঁশী আছে, অথচ তিনি বাজাইতেছেন না। সুবল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কৃষ্ণ, আজ তোমার একি হইল; তুমি আনমনে কি ভাব্‌ছ?' কৃষ্ণ বলিলেন, 'ভাই, তোমার কাছে লুকাইয়া আর কি ফল? কাল পৌর্ণমাসী আসিয়া আমার কাছে রাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছে। সেই অবধি আমি রাধিকাকে দেখিবার জন্য বড়ই চঞ্চল হইয়াছি।

সুবল বলেন সখা যেন রূপ তার।
তাহাতে মোহিত হয় সকল সংসার॥
শুনিমাত্র যদি তুমি হয়েছ চঞ্চল।
দেখিলে হইবে তুমি নিতান্ত পাগল॥
অতএব তাহে দেখি নাহি প্রয়োজন।
চল যাই এখান ছাড়িয়া অন্য বন॥
শুনিয়াছি সেহ পূজা করিতে রবিরে।
আসিবেক আজি ওই রবির মন্দিরে॥
তার পথ এই হয় আসিতে আসিতে।
যদি দেখ তবে স্থির নারিবে হইতে॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন সখা যা ঘটে ঘটিবে।
কিন্তু তারে একবার দেখিতে হইবে॥

শ্রীকৃষ্ণ সুবলের সহিত এইরূপ আলাপচারি করিতেছেন, এমন সময় রাধিকা দুই সখী লইয়া সেই দিকে আসিতেছেন। তিনি দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ললিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

সখি দেখহ সখি দেখহ
নবনীপকমূলে
ত্যজি অম্বর ধরণীপর
নবনীরদ বুলে
দলিতাঞ্জন- চয়গঞ্জন
মধুরদ্যুতিজালে
'করু শ্যামল পৃথিবীতল
নভমণ্ডল-ভালে
চপলাততি ঝলকে তভি
থির অদভুত কাঁতি
অতি পাণ্ডুর রুচি সুন্দর
বিলসে বকপাঁতি
সুরভূপতি- ধনুরাকৃতি
বহু রঙ্গহি সাজে
সুষমাযুত অতি অদ্ভুত
শশিমণ্ডল রাজে

অর্থাৎ রাধিকা বলিতেছেন, সখি, কদম্বের মূলে নূতন মেঘ আকাশ ছাড়িয়া আসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে মেঘের দ্যুতি ভাঙ্গা আঁজনের অপেক্ষাও সুন্দর—পৃথিবীকে একেবারে শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। তাহাতে বিদ্যুৎ ঝলকিতেছে, কিন্তু তাহার কান্তি স্থির—এ বড় অদ্ভুত। অতি সুন্দর শাদা বকপক্ষী উড়িতেছে—সেই মেঘের উপর আবার ইন্দ্রধনু নানা রঙ্গে সাজিয়া রহিয়াছে। এ অদ্ভুত মেঘ আকাশ ছাড়িয়া পৃথিবীতে কেমন করিয়া আসিল ?

তখন ললিতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ও মেঘ নয়। ও একটি মনুষ্য। তুমি যাহাকে বিদ্যুৎ বলিয়া মনে করিতেছ তাহা বিদ্যুৎ নয়—ও তাহার পীত বসন। তুমি যাহাকে বক-পক্ষী বলিয়া মনে করিয়াছ—সে উহার হার। আর তুমি যাহাকে রামধনু মনে করিতেছ—সে উহার চূড়ার ময়ূরপাখা। বিশাখা বলিলেন, 'পৌর্ণমাসীর কেমন চাতুরী দেখিলে? সূর্য্য-পূজার ছলে তিনি তোমাকে এখানে আনাইয়া তোমার বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া দিলেন।' এই বলিয়া বিশাখা শ্রীকৃষ্ণ-রূপ বর্ণনা করিতেছেন।

অপরূপ কৃষ্ণরূপ না হয় বর্ণন।
হরে মন যেই জন করয়ে দর্শন॥
নবঘন সুচিক্কণ অঞ্জন সমান।
অঙ্গশোভা মনোলোভা হরয়ে নয়ান॥
শোভা করে চূড়াশিরে শিখণ্ড রচিত।
যাহা দেখি হয় সুখী রমণীর চিত॥
দেখি কেশে লজ্জাবেশে যাবত চামরী।
আগে গিয়া লুকাইয়া বনের ভিতরি॥
শ্রীবদন দেখি মন করে অনুমান।
পূর্ণিমার শশী ছার নহে উপমান॥
শোভে ভাল কিবা ভাল যেন অর্দ্ধ ইন্দু।
তাহে ভায় শশিপ্রায় চন্দনের বিন্দু॥
ভুরুদ্বয় বুঝি হয় কামের কোদণ্ড।
বর্ষে যারা শরধারা কটাক্ষ প্রচণ্ড॥
অতিশ্রেষ্ঠ নাসাওষ্ঠ সুন্দর নয়ন।
যাহা হেরি ব্রজনারী হারাইল মন॥
দরপণ সুশোভন শ্রীগণ্ডযুগল।
যার তেজে অতিরাজে মকরকুণ্ডল॥

ভুজদণ্ড করিশুণ্ড সমান গঠন।
শোভা পায় কত তায় তাড়ঙ্ক কঙ্কণ॥
দুই পাণি দেখি মানি মোরা মনে মনে।
নাহি স্থান উপমান দিতে ত্রিভুবনে॥
শোভে তাহে বেনুআ হে মোহিত সংসার।
যে হরিল কুলশীল সব গোপিকার॥
পরিসর মনোহর বুকের বলনা।
করে আলা বনমালা তাহে ধনি ধনি॥
সিংহজিনি মাজাখানি ক্ষীণ অতিশয়।
পীতধটি পরিপাটি কোটিতে শোভয়॥
কিবা উরু রম্ভাতরু সমান শোভন।
বান্ধে নারী মন করি যাহাতে মদন॥
শ্রীচরণ শুশোভন শীতল কোমল।
দেখি যারে লাজে মরে রাতুল কমল॥
কিবা তায় শোভা পায় সুবর্ণ নূপুর।
যার রব করে সব মনদুঃখ দূর॥
দেখ সাধ ভরি আঁখি শ্রীবংশীমোহন।
দেখি যারে স্থানান্তরে যাবেনা নয়ন॥

বিশাখার এইরূপ বর্ণনা একটি অমৃতের নদী—আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভাও আর একটি অমৃত নদী। এক নদী কাণ দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল, আর নদী চক্ষু দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিল। দুই নদীর অমৃতে অমৃতরসের আধার হৃদয় ভরিয়া গেল, পূর্ণ হইয়া গেল। ক্রমে সে অমৃত, হৃদয় ছাপাইয়া বাহির হইতে লাগিল। তাই কখনও রাধিকার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কখনও ঘাম হইয়া গা দিয়া ছুটিতে লাগিল।

যেমন কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধা বিস্মৃত ও মুগ্ধ হইয়াছেন, কৃষ্ণও সেইরূপ রাধিকার রূপ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন।—

কিবা স্বর্ণবর্ণজিনি অঙ্গের মাধুরী।
করিয়াছে ধরিয়া কি চন্দ্রিকা বিজুরী॥
কেশজাল কাল সূক্ষ্ম চিকণ শোভয়।
পামর চামর তুল্য ইহারে কে কয়॥
দিব্যবেশ কেশ দেখি এই মানে মন।
বুঝি রতিপতি জাল করেছে পাতন॥
পড়ি যায় হায় মোর নয়ন-খঞ্জন।
উঠিবারে নারে আর পাইল বন্ধন॥

* * * *

যদি শশী ঘষি ঘষি ঘুচায় লাঞ্ছন।
হইবারে পারে তবে এ মুখ যেমন॥
শশী-খণ্ড-চণ্ড-মদ-দমন কপাল।
তাহে বিন্দু সিন্দূরের সাজে অতি ভাল॥
কালসর্প দর্পজয়ী কিবা ভুরুদ্বয়।
মন মোর ঘোর কাম ধনুক মানয়॥

* * * *

ওষ্ঠাধরে ধরে শোভা প্রবাল সমান।
বিম্বফলে বলে কে ইহার উপমান॥
তাহে মন্দ মন্দ হাসি শশীর প্রকাশ।
যাহা হেরি মেরি ধৈর্য্য লজ্জা হল নাশ॥

* * * * *

পয়োধরে ধরে শোভা পদ্মকলিকার।
করিকুম্ভে কুম্ভে কিবা উপমা ইহার॥
তাহে ভাল কাল শ্রীকাঁচুলী শোভা করে।
নবঘনগণ যেন সুমেরু শিখরে॥
তদুপরি পরিষ্কার হার সুশোভন।
বকমালা আলা করে যেন সেই স্থান॥

রোমাবলী লালিত লাবণি বিলোকিয়া।
ত্যজি কাল ব্যালদর্প গর্ত্তে আছে গিয়া॥
মাঝাখানি মানি মুষ্টি মাঝে ধরা যায়।
পঞ্চানন বনে গেছে যা দেখে লজ্জায়॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধার দিকে চাহিয়া সুবলের সহিত কথা কহিতে-ছেন—রাধাও শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া সখীদের সহিত কথা কহিতে-ছেন।

তবে চারি চক্ষুতে চক্ষুতে দরশন।
হয় রণে বাণে বাণে সংযোগ যেমন॥
পরস্পর দরশনে বড় লজ্জা পাই।
ফিরাইলা আপনার নয়নেরে রাই॥
কেহ কহে কৃষ্ণনেত্র-শর বল ধরে।
তেঁহ ঠেলি লয়ে গেল রাধানেত্র-শরে॥
আমি কহি রাধানেত্র হয় বলবান।
টানি লয়ে গেল কৃষ্ণনেত্রে নিজ স্থান॥
যেহেতু কৃষ্ণনেত্র সেথান হইতে।
নিজ স্থানে না পারিল ফিরিয়া আসিতে॥
নয়ন ফিরাই রাই মুখ নামাইলা।
বুঝি ভূমিপানে চাহি পুঁছিতে লাগিলা॥
কিবা পুণ্য করিয়াছ তুমিহ ধরণী।
যাহে ভ্রমিছেন তোহে এ পুরুষমণি॥
মোরে যদি সেই পুণ্য কহ কৃপা করি।
তবে আমি তাহা করি তব দেহ ধরি॥
তাহা হলে এই দিব্য পুরুষরতন।
আমারি উপরে সুখে করেন ভ্রমণ॥

রাধিকা যখন এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন ললিতা বলিলেন, তুমি

কেন মুখ নীচু করিয়া রহিয়াছ? নয়ন ভরিয়া একবার কৃষ্ণরূপ দেখ। তাহাতে রাধিকা উত্তর করিতেছেন

রাধিকা কহেন কি করিব নিরীক্ষণ।
দেয় নাই মোরে বিধি অধিক নয়ন॥
যদি কোটি আঁখি দিত নিমেষ রহিত।
তবে বুঝি দেখি আশা পূরিত কিঞ্চিত॥
একে দুই আঁখি তাহে আছয়ে নিমেষ।
পূর্ণ নাহি হয় দেখি লালসার লেশ॥
অতএব চক্ষু মুদি করিয়ে ভাবনা।
তাহে পূর্ণ হতে পারে মনের বাসনা॥

ললিতা বলিলেন, 'তাই বেশ, তাই বেশ। সেই রকমই করিও। কিন্তু এখন ত সূর্য্যপূজার সময় বহিয়া যায়, চল সূর্য্যের মন্দিরে যাই।' তিন জনে চলিলেন, কিন্তু রাধিকা বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে বিলম্ব হইতে লাগিল, ললিতা বড় চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "ও রূপ বার বার পিছন দিকে চাহিতে চাহিতে চলিলে পায়ে হোঁচট লাগিবে, কাঁটা ফুটিবে। লোকে তোমার নিন্দা করিবে"

বিশাখা বলেন "দোষ নাহি রাধিকার।
নেত্র আকর্ষক বড় লাবণ্য কালার॥
ও লাবণ্যে পড়িলে নয়ন একবার।
টানিয়া লইতে পারে পুন কেবা আর।

যাহা হউক ক্রমে তাঁহারা সূর্য্যের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ত একজন ব্রাহ্মণ চাই। নহিলে পূজা করায় কে? সে বনে কোথায় ব্রাহ্মণ পাইবেন বলিয়া, তাঁহারা বড় চিন্তিত হইলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সখা মধুমঙ্গল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মধুমঙ্গল ব্রাহ্মণ। মধুমঙ্গল যে তথায় আসিবেন, এটাও

পৌর্ণমাসী যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। ললিতা বলিলেন, 'মধুমঙ্গল, তুমি রাধিকাকে সূর্য্যপূজা করাও।' মধুমঙ্গল বলিলেন,

"শুনি বাণী মোর, মিত্রে যদি থাকে প্রীত।
রাধিকার তবে আমি হব পুরোহিত॥
অন্যথা না করাইব আমিহ পূজন।
যদ্যপিও দক্ষিণাতে দাও বহুধন॥

এখানে মিত্র শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। এক অর্থে সূর্য্য, আর এক অর্থে বন্ধু। সূর্য্যের প্রতি ভক্তির ছলে মধুমঙ্গল কৃষ্ণের প্রতি প্রেম যাচ্ঞা করিতেছেন। এইরূপ দুই অর্থে শব্দ ব্যবহার করা সেকালের কবিরা বড় ভালবাসিতেন। কবি সংস্কৃতই লিখুন আর ভাষাই লিখুন, লয়মত দুটো দুই অর্থের শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের কবি রঘুনন্দনও অনেক যায়গায় এইরূপে দুই অর্থের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সূর্য্যপূজার মন্ত্র পড়িতে গিয়া, সঙ্কল্প করাইতে গিয়া মধুমঙ্গল বলিতেছেন, বল

"হরিপ্রীতি কামে করি হরির পূজন"

এখানেও কবি আবার হরিশব্দ দুই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। হরিশব্দে সূর্য্য ও হরিশব্দে কৃষ্ণ। তাহাতে ললিতা বলিলেন, "ও কি কর? পূজা করিতে বসিয়াছ—কপট বাক্য কেন বল?" মধুমঙ্গল বলিলেন, "আমি কপট বাক্য বলি নাই। যদি ছল ধরিতে বস, সকল কথাতেই ছল ধরিতে পার।"

যে হউক্ সে হউক্ হয়ে গিয়াছে সঙ্কল্প।
এখন তোমার ব্যর্থ এ সব বিকল্প॥

ক্রমে সূর্য্যপূজা হইয়া গেল। রাধিকা সোণার অঙ্গুরী দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। মধুমঙ্গল একে ব্রাহ্মণ তায় ছেলেমানুষ। বলিলেন,

'আমি সোণা লইয়া কি করিব? আমায় গোটাকতক মোয়া দাও।' রাধিকার এক সখী মধুমঙ্গলের আঁচলে মোয়া বাঁধিয়া দিলেন।

আবার পথে আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন হইল। কৃষ্ণ বলিলেন, স্ত্রীলোক বড় কৃপণ! সূর্য্যের পূজায় সোণা দক্ষিণা দিতে হয়। তাহা না দিয়া দিয়াছে কিনা গোটাকতক মোয়া। ইহাতে কি পূজার ফল হয়?

কৃষ্ণ যে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাইতেছেন, সে কথা ললিতা জানিত। চন্দ্রাবলী ভদ্রকালীর পূজা করিতেন, তাহাও সে জানিত। তাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,

"যেইজন ভদ্রকালী দেবীরে পূজয়।
তারি ফল সিদ্ধি বাঞ্ছা করিবারে হয়॥
যেহেতুক তাহে আছে নিজ প্রয়োজন।
উদাসীন জন লাগি নিরর্থ চিন্তন॥

শ্রীকৃষ্ণ এই তীব্র ব্যঙ্গের মর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারিলেন। এবং বলিলেন—

... .সাধু স্বভাব এ হয়।
পরের অহিত দেখি সহিতে নারয়॥

সখাদের সহিত কৃষ্ণের এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি হইতেছে এমন সময় মধুমঙ্গল মাঝে পড়িয়া বলিলেন,

বটু বলে সখা তোর কথা অনুচিত।
যেহেতুক এই দক্ষিণাতে মোর প্রীত॥
যাহা পাই তুষ্ট হয় আচার্য্য হৃদয়।
সেই দক্ষিণায় পূজকের ফল হয়॥

তখন সকলে আপনাপন ঘরে চলিয়া গেল।

এই কৃষ্ণ ও রাধার প্রথম মিলন। এ মিলনের মধ্যবর্ত্তী দেবী পৌর্ণমাসী। তাঁহার অবলম্বন মধুমঙ্গল। পৌর্ণমাসী ও মধুমঙ্গল দুটিই বাঙ্গালী কবির সৃষ্টি! কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম বাঙ্গালীর মনের

মত করিবার জন্য বাঙ্গালী কবিরা একটি বুড়ী ও একটি ছেলে আনিয়া যোগাইয়াছেন। এরূপ যোগান কবিদের স্বভাব। দেখুন না, মহাভারতের শকুন্তলা বনের মাঝে নিজেই রাজার সহিত সব কথাবার্ত্তা কহিলেন। রাজসভায় আসিয়াও নিজেই নিজের জন্য ওকালতী করিলেন। কিন্তু কালিদাস সে ভাবে শকুন্তলাকে দেখাইতে পারিলেন না। বনের মধ্যে শকুন্তলার সঙ্গে দুটি সখী ছিলেন। একটিতে হইল না—দুটি। রাজসভায়ও সঙ্গে দুটি ব্রাহ্মণ পড়ুয়া ছিলেন। সেখানেও একটিতে হইল না, দুটি। যদি এই চারিটি না দেন, কালিদাসের সময় কেহও সে শকুন্তলা পছন্দ করিত না। এখানেও সেইরূপ, বাঙ্গালী কবিরা পৌর্ণমাসী ও মধুমঙ্গল এই দুটিকে আনিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমে যোগ করিয়া দিলেন। বাঙ্গালা কবিরা আরও একটি নূতন জিনিস আনিয়াছেন। সেটি চন্দ্রাবলী। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে রাধিকার সতীন। সুতরাং রাধিকার একটি সতীন জুটাইয়া কবিরা রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম আরও ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই সব নূতন নূতন মানুষ গড়ার কথা পরে হয় ত আবার বেশী করিয়া বলিতে হইবে। সুতরাং এখানে সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে। কিন্তু কৃষ্ণরাধার প্রথম দর্শনে কবি কি বাহাদুরীই করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রথম দর্শনে রাধিকার বিস্ময়-চকিত ভাব—স্তব্ধ ভাব, কি সুন্দর ভাবেই দেখান হইয়াছে। রাধিকা প্রথম মানুষ বলিয়াই চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মনে হইয়াছিল কদম্বের মূলে এক খণ্ড মেঘ পড়িয়া আছে। তাহাতে স্থির বিদ্যুৎ, মেঘের পাশে হাঁসের সার ও তাহার উপর রামধনু। অনেক কষ্টে সখীরা যখন বুঝাইয়া দিলেন ও মেঘ নয়, ওই কৃষ্ণ। তখন রাধিকা একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, আর এক সখী কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। চোখেও কৃষ্ণ, কাণেও কৃষ্ণ। কবি বলিলেন, দুই ইন্দ্রিয় দিয়া দুটি অমৃতের নদী রাধিকার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণেই সে হৃদয় ছাপাইয়া উঠিল। রাধিকার সাত্ত্বিক ভাবের

উদয় হইল। স্বেদ, অশ্রু ঝরিতে লাগিল। কৃষ্ণেরও রাধিকাকে প্রথম দেখিয়া এরূপ ভাবই হইয়াছিল। ক্রমে যখন চার চক্ষের মিলন হইল, কবি বলিলেন, 'এত চক্ষের মিলন নয়, এ যেন বাণে বাণে যুদ্ধ। কেবল বিবাদ কার বাণের বল বেশী। কেহ বলিলেন, কৃষ্ণের বাণের বল বেশী। কবি বলিলেন সেটা একেবারেই নয়, রাধার বাণেরই বল বেশী। তিনি সেটি কি প্রকারে প্রমাণ করিয়াছেন, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

কৃত্তিবাস*

ব্যাস বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস।—সামান্য প্রণিধান সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধ হয় যে, সংস্কৃত অনার্য্য কাব্যাবলীর অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাল্মীকির প্রভাব সুপরিস্ফুট, কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ বা রত্নাকরের নানারত্ন-সমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; এক-ভাবে না এক-ভাবে যেমন ব্যাসবাল্মীকি এই উভয়ের একতরের কার্য্যের আদর্শ, পরবর্ত্তী অনার্য্য কবিকুলের কাব্যাবলীর উপজীব্য, তদ্রূপ, বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব,—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব, তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যক্‌রূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ, যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির পাদ-

* স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। ২৭শে চৈত্র, ১৩২২ সাল।

পূজা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তদীয় কবিতারূপী কল্পনা-কানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে, সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাসবাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই-ই সম্বন্ধ।

কালিদাস ও কৃত্তিবাস।—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রামচরিতেরই পুনর্ব্বর্ণন করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ ভারতের বিবদ্বৃন্দ সাদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার হেতু কি? একান্ত সুপরিচিত, সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন-পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পত্তিশালিনী না হইত, তাহা হইলে, কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনাবিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি বিরচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জনসমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র নিদান, ভাষাগত প্রাঞ্জলতার উৎকর্ষাপকর্ষ এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়-

বিশেষের জন্য উপনিবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিত-দিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সকল-জনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। তাদৃশী ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্র-দায়নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশি-ক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস যেমন তাদৃশী সর্ব্বতোগামিনী সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়ে, সকল সময়ে সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনাস্ত রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ, এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই কাব্যাদির প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়া-ছেন।

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণকারগণ।—কৃত্তিবাসের পর আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ

পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

এপর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবদ্ধ করেন। তাহার পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি রামায়ণী কথায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কালে হয় ত, আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস-লেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি। কৃত্তি-বাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য, সাহিত্যপরিষদ্ এবং দীনেশ বাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে, সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোকমুখে স্ত্রীপুরুষ সমাজে রামসীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থরচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে, তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসোচিত মৌলি-

কতা নাই। অধিকাংশ স্থানেই অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনায় চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থের ক্বচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনামান্দ্য দোষে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। কবিচন্দ্র স্বীয় রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশ সমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন; যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত, তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকারগণের অনেকেরই দুই একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায় রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান্, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণপূর্ব্বক কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনু-

সময়ে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণগ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ-রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরাবণের" অশোকবন-বর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই এই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায়, তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার "রামায়ণ" অপরাপর "রামায়ণ" অপেক্ষা ভাবুকসমাজে, অথবা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, যে, পাঠকালে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত

হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তরচরিতের নিরবদ্য ও নয়ন-রঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে, সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনু-গত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরু ভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্য চিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ।—কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈত-ন্যের আবির্ভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবির্ভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের “বাণ” বহিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণ-সমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশটাকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া, তাবৎ সাহিত্যকে ‘তদ্ভাবভাবিত’ করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর কি করুণ, সকল রসেই নদিয়ার ভক্তির তরঙ্গের

উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ, সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণব সেবকগণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকটের পর, কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই একটি স্থলের ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণ-সূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমনকি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেখানে আছে

"পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"

সেই স্থানে—পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে,

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদি-কবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন!! কবির কাব্য পরিষ্কৃত

করিতে যাইয়া, সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্যও নিহিত আছে। আমাদের দেশে, যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে, ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নবীন নানাবিধ ভঙ্গিরাগবিভূষিতা, শ্রুতিমোহনা বঙ্গভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনি আমরা আমাদের প্রাচীন, দুর্ব্বোধ্য শব্দসঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম, তাই আমার প্রাচীন

"অমিয় সায়ারে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল" ইহার স্থলে

"অমিয় সাগরে নিশান করিতে সকলি গরল হলো" করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পঞ্জরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণযোজনা করিয়া, প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। ইহাতে প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্দ্ধ-সংস্কৃত, অর্দ্ধ-হিন্দি অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের

"মুঞি" "ভিলন্তু" "কয়্যা" "থুয়্যা" "পাকল" প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই; যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহার গ্রহণ করিবে। যাহা বর্জ্জনীয়, কাল তাহার বর্জ্জন করিবে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্তপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণবপ্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ

প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পূরিয়া দিয়া, স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

কৃত্তিবাসের কল্পনা তাহার গন্তব্য পথ।—রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস ভবভূতি রঘুবংশ উত্তরচরিত প্রভৃতির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যেস্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে, অনেক স্থলে মুল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষিক্ষুণ্ণপথ কল্পনার দৌত্যে অল্প-বিস্তর ছাড়িয়া, অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ব্বক, তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার আত্মকল্পনার চরম উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া কবিকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বৈরচারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে,

কোথাও বা নূতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা,' সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কবির পরিচয়।—আনুমানিক ১৩০৬শক ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতি-গৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকলবিভব-সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" বলিয়া যেদিন ভক্তি-গদগদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভ ক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃঃ অব্দে আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ" ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয়—"ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজতধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দ-র্য্যের ইহা লীলা-নিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানী-ন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একে-বারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়

"ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরমদয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমাপ্তির পর, তদানীন্তন প্রথা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্মপরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন।

> "সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
> মুনিমধ্যে বাখানি' বাল্মীকি মহামুনি।
> পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী"

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব! এখনও "ফুলিয়ার মুখটি" বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি"—কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগ-রঞ্জিতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিয়াছিল,—বঙ্গভূমি,

বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জন-পদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে, কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক্ অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত ব্যক্তিও প্রেমভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়-হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্ণে ধূসর-বসনা বিধবারা সমবেত হইয়া, কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাসক্লিষ্ট হৃদয়ের ভক্তির রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুরভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পদ পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব,—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে, বিপণির পণ্যকুটীরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যা'র গঙ্গা তরঙ্গিণী"

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়ায়" কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই, কিন্তু সেই "ফুলিয়া পণ্ডিতের" মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া, বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী,

অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমলকর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য-সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে, আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না, সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন, তাই তদীয় কবিতার কুত্রাপি কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না। সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন, এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য-চিন্তা-বিযুক্ত হইয়া, মহাকবি, তাঁহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাঁহার সেবা করিয়াছে, আচন্দ্র-দিবাকর করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ, হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে, কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয় ত, তোমার কল্পনা-দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে। তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত, নিজেকে মিশাইতে

না পার, “তদ্ভাব-ভাবিত” করিতে না পার, তবে কদাচ, তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসীগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপকরাগের সময়ে তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এদেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশবাসীগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিক-ঝঙ্কারের ন্যায়, বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ, একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান্, কতটুকু চান্, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে, তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,—এজ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কাব্যবিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, তোমার সামাজিক বর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে, তদ্দীয় দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্য্য রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর-ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভালবাসিতেন। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুণ্ গুণ্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুণ্ গুণ্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক একপদে তাঁহার কর্ম্মফল দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ, প্রেমিক কবি কৃত্তি-বাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বরলহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া, ভারতবাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুল কুল গীতির সুরে সুর মিশাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যে শেষ লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই, তবুও সে রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজী-বন থাকিবেও, তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে

কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রহিয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটী, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরব স্থান, পরমস্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণমন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের স্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন, সেই সঙ্গীতের "তান প্রদান" করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে, তাঁহার স্বজাতির জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র, আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন,—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সমুন্নতবংশের কৃত্তিবাস অলঙ্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটীর একজন কবিতারসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া

এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাহাদিগের সারস্বতভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবিত, কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া

"পবন নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

তপস্বিনী

১

সৌন্দর্য্যের চিত্রশালা-নিরালায়, আনন্দে অধীর,
লয়ে রাঙ্গা কল্পনা-তুলিকা,
শত শত নারীমূর্ত্তি আঁকিয়াছি, মুছি অশ্রুনীর,
শত শত তরুণী বালিকা,—
সুন্দরীর রক্তগ্রীবা বেলহারে করেছি মধুরা,
চিত্রিয়াছি বিধবারে, হাতে দিয়া ধবল ধুতূরা!

২

আজি কিন্তু কে গো তুমি, অকস্মাৎ দাঁড়াইলে আসি,
আমার এ চিত্রশালা-মাঝে ?
অঙ্গে তব অয়ি দেবি, বালসূর্য্য-কিরণের রাশি!—
আড়ষ্ট হইল আজি লাজে
কল্পনা-তুলিকা মম, কালিকার পাদপদ্মে আসি,
লাজে যথা হয় ম্লান আরক্তিম কমলের রাশি।

৩

নারীত্ব দেবত্ব-মাঝে ডুবে গেছে!—অপূর্ব্ব মুরতি!
এ গো নয় অলীক ভারতী!
পুণ্যের মাহেন্দ্র ক্ষণে, দলাসলা পতঙ্গ যেমতি,
অকস্মাৎ হয় প্রজাপতি।
আরতির থালে যথা অতিতুচ্ছ ধবল কর্পূর,
ধরে আহা দেব-কান্তি, অপরূপ, উজ্জ্বল-মধুর!

৪

নিশিদিন নিশিদিন, শুভ্রচিন্তা-গুগ্‌গুল জ্বালিয়া,
মহাসুন্দরের করি ধ্যান,
লভিয়াছ কি মহিমা, কি গরিমা! আলোকে ডুবিয়া,
ঝলকিছে উজ্জ্বল নয়ান!—
নারীচক্ষু হইয়াছে দেবচক্ষু! জ্যোতির মণ্ডলে,
লভিয়া সাবিত্রীপ্রভা, গায়ত্রীর আঁখি যেন জ্বলে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

এস

এস এস প্রিয়া হৃদয়ের আরো কাছে,
অধর তোমার চুম্বন-সুরা ভরা,
চির তৃষাতুর আজি সে মদিরা যাচে,
এস প্রিয়া এস সকল পিপাসাহরা !

আরো কাছে প্রিয়া—আরো কাছে এস ঘেঁসে ;
মদির-অলস দুটি আঁখি তুলে চাও,
দুটি ভুজপাশে বাঁধ ওগো ভালবেসে,
অধর-পেয়ালা ভরি সুরা তুলে দাও !

আরো কাছে প্রিয়া—মিছে সীমান্ত রেখা
কি কাজ আড়ালে ঘুচাও বাসাঞ্চল,
অন্তরে যদি মিলন মাধুরী লেখা,
কেন ঢাকে তবে হৃদয়ের শতদল ?

পিপাসায় ওরা কাঁপিতেছে থর থর,
আড়াল হইতে আসিতে চাহে যে ছুটি,
মোর বুকে আছে শীত-সুধা সরোবর,
যাক তারা সেথা চির-আনন্দে ফুটি !

এস প্রিয়া এস হৃদয়-বিলাস-মন্দিরে,
হে ভীরু ঘুচাও নিষ্ঠুর নীবিবন্ধনে,
ব্যর্থ কোরোনা আজি এ জীবন-সঙ্গীরে,
স্বার্থক কর চিরকামনার ক্রন্দনে !

আরো কাছে প্রিয়া—আরো আরো কাছে
এস ডুবে যাই দুই জনে দুজনায়
গহন গভীর বিলাস-রভস মাঝে
ছায়া-মায়া ঘেরা অতল সে অজানায়।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

দুই পথ

প্রভাতে ফুলের বনে প্রথম ফাল্গুনে ফুটে
গোলাপের অরুণিমা লক্ষ রক্ত পত্র পুটে!
কহিল সে—"এ আনন্দে হৃদি-তন্ত্রী টুটে যায়,
রেখো না ডুবায়ে মোরে শুধু স্বর্ণমদিরায়!

থেমে গেল কণ্ঠে কণ্ঠে বাসনা-বাঁশরী-রাগ,
ধূলী'পরে ছিন্নফুল হৃদয়ের অনুরাগ!
কহিল সে—"শূন্য ধরা রিক্তশোভা প্রাণহীন,
এ শীর্ণ জীবন লয়ে রব আর কতদিন!

শ্রীসুশীলকুমার দে।

মহাপ্রসাদ

বাসনার ধূলি-বাস ধু'য়ে এস মন!
ভক্তি-সিন্ধু-নীরে;
কণ্ঠে ধরি' সমুদ্রের অশ্রান্ত ভজন
পশ শ্রীমন্দিরে।
ভক্তের চরণ-রেণু সোপানে সোপানে
মাখ সর্ব্ব গায়,
লুটাও—লুটাও শির বিহ্বল পরাণে
জগন্নাথ-পায়।
হেথা মন্ত্র বিসর্জ্জন—আত্ম-সমর্পণ,
মমত্বের বলি;
নাথের চরণ-পদ্মে কর নিবেদন
ত্যাগের অঞ্জলি।
ভোগ্য যাহা, দেহ তুলি' দেবতার ভোগে,
ধরহ প্রসাদ;
কি সুগন্ধ! কি আনন্দ! প্রেম-রস যোগে
কি অমৃত স্বাদ!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[১৩]

[চৈত্রের (১৩২২) নারায়ণের ৫৪৮ পৃষ্ঠার ক্রমানুবৃত্তি]

ভগবদগীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (৮)

পরা-প্রকৃতি বা জীবতত্ত্ব।

গীতায় ভগবান আপনার দ্বিবিধ প্রকৃতির উল্লেখ করিয়া, ভূমি আপ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত, এই অষ্টবিধা ভিন্না প্রকৃতিকে অপরা বা নিকৃষ্ট বলিয়া, জীবভূত তাঁহার যে আর এক প্রকৃতি আছে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আর এই জীব-প্রকৃতির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে এই জীব-প্রকৃতির দ্বারাই আমি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছি। এখানে আমরা দুইটি কথা পাই, এক জগৎ, অপর জীব। এই জীব যে কি, ইহা জানিতে হইলে, প্রথমে এই জগৎটা যে কি তাহা জানা আবশ্যক।

জগতের মূল অর্থ—যাহা কেবলই চলে। ঈশোপনিষদে "জগত্যাং জগৎ" কথা ব্যবহার করিয়াছেন। "জগত্যাং" অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে, "যৎকিঞ্চ"—যাহা কিছু, "জগৎ"—নিয়ত চলিতেছে বা চঞ্চল,—শ্রুতি এখানে তাহাকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সোজা কথায় এই বলা হইল যে, এই যে চঞ্চল প্রবাহের সমষ্টিরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে যাহা কিছু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, তৎসমুদায়েতে ঈশ্বরের আবির্ভাব চিন্তা করিতে হইবে। আর এই ঈশ্বর কে? না, যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চঞ্চলের মধ্যে স্থির,

পরিণামের মধ্যে অপরিণামী, তিনিই ঈশ্বর। তাঁহার সত্তাতেই এই চঞ্চল প্রবাহের, এই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের, এই পরিণামী সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা। তিনিই এই নিয়ত-চঞ্চলায়মান জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন। কিসের দ্বারা? গীতায় কহিতেছেন—তাঁর যে শ্রেষ্ঠ জীব-প্রকৃতি তাহারই দ্বারা।

এই জগৎ চঞ্চল, ইহা প্রবাহ-স্বরূপ, কেবলই চলিতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পরিণামের পর পরিণাম পাইতেছে। একথার প্রথম সাক্ষী আমাদের এই সকল ইন্দ্রিয়। এই সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা এই জগতের যা-কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। এই জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপেই আমাদিগের জ্ঞানেতে প্রকাশিত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এছাড়া এই জড়প্রকৃতির সম্বন্ধে আমাদের আর কোনও জ্ঞান নাই। আর শব্দের সাক্ষী কাণ। শ্রবণেন্দ্রিয়েতেই শব্দের প্রতিষ্ঠা। যার কাণ নাই, সে এজগতে যে শব্দ বলিয়া কোনও কিছু আছে, ইহা জানে না, ইহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। এইরূপে স্পর্শের সাক্ষী ত্বক। এই ত্বকেতেই যাবতীয় স্পর্শের প্রতিষ্ঠা। যে এই স্পর্শ-শক্তি হারাইয়াছে, সে বস্তুর উষ্ণতা, শীতলতা, কোমলতা, কাঠিনতা, মসৃণতা, বন্ধুরতা প্রভৃতির জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। রূপ এইরূপে চক্ষুর অধীন, চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত। রস রসনায়, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপরেই আমাদের এই প্রত্যক্ষ বহির্জ্জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এসকল ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যেতেই আমরা এই শব্দস্পর্শরূপরসময় বিষয়রাজ্য যে আছে, ইহা জানি ও বিশ্বাস করি। সুতরাং আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ ইহাকে আমার এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ অন্তরিন্দ্রিয় যে মন, ও মনের প্রতিষ্ঠা যে বুদ্ধি ও বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা যে অহঙ্কার বা ব্যষ্টিবোধ বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান বা empirical ego, এই সকলই ধারণ করিয়া আছে। আমার চক্ষুরাদি যদি না থাকিত, আমার অন্তরিন্দ্রিয় মনও যদি না থাকিত, আমার ধারণা

শক্তি বা বুদ্ধি ও অহঙ্কার এসকল যদি না থাকিত, তাহা হইলে আমার নিকটে এই ব্রহ্মাণ্ডও ত থাকিত না। আমার এই জগতের প্রমাণ আমার ইন্দ্রিয়াদি। এই জগতের প্রতিষ্ঠা আমার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অহঙ্কারেতে।

এখানে একটা গোল বাধে। আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই যদি এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার এসকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সৃষ্টি ও আমার ইন্দ্রিয়ের বিনাশে ইহার লয় অবশ্যই হইবে। কিন্তু তাহা ত হয় না। আমার জন্মের পূর্ব্বে ত আমার ইন্দ্রিয়সকল ছিল না, কিন্তু তখন কি এই জগৎও ছিল না? এমন কথা ত বলিতে পারি না। কারণ আমার জন্মের পূর্ব্বে যে এই জগৎ ছিল, তার বহুতর বর্ত্তমান ও অতীত সাক্ষী আছেন। আমার মৃত্যুর পরেও যে এজগৎ থাকিবে, তাহাও অকাট্য অনুমানেতে সিদ্ধ হয়। অতএব এখানে এই প্রশ্ন উঠে, তবে এ জগতের প্রতিষ্ঠা কে? কে এই জগতকে ধারণ করিয়া আছেন? আমার জন্মের পূর্ব্বেও ধারণ করিয়াছিলেন, জন্মের পরেও ধারণ করিয়া আছেন, মৃত্যুর পরেও ধারণ করিয়া থাকিবেন? তিনি কে?

দেখিতেছি যে দৃষ্টি ভিন্ন রূপের প্রমাণ নাই। শ্রুতি ভিন্ন শব্দের প্রমাণ নাই। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতিতেই জগতের রূপ-রসাদির প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা। আমরা যাহাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা ইংরাজিতে sensation বলি, তাহারই উপরে এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় জগ-তের প্রতিষ্ঠা। অনুভূতি অর্থ জ্ঞান। শব্দস্পর্শাদির জ্ঞানেতেই শব্দস্পর্শাদির প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা। জ্ঞান নাই অথচ বস্তু আছে, ইহা অসম্ভব। আর শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান শ্রুতিপ্রভৃতির শক্তির অপেক্ষা রাখে। অন্যপক্ষে ইহাও দেখিতেছি যে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি সসীম, দেশকালের বন্ধনে আবদ্ধ। আর আমরা একের পর এক এই সংসারে আসিতেছি ও ক্রমে কালবশে চলিয়া যাইতেছি। আর বিজ্ঞান একথাও বলে যে এমন একদিন ছিল যখন এই জগৎ

অতি সূক্ষ্ম আকারে, বীজের মতন বিদ্যমান ছিল, তখন ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্পন্ন বা ইন্দ্রিয়-শক্তি-সম্পন্ন কোনও জীবের উৎপত্তি হইয়া ছিল বলিয়া কল্পনাও করা যায় না। এসকল দেখিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে এই প্রশ্ন উঠে :—

জ্ঞানেতেই যখন জগতের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত ; শব্দস্পর্শাদিগুণসম্পন্ন এই জগৎ শ্রুতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তির সাক্ষ্যেই আপনাকে সপ্রমাণ করে, এসকল ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ইহার প্রতিষ্ঠা ; অন্য কোনও কিছুতেই ইহা যে আছে বা ছিল তাহা জানা ও বুঝা যায় না ; আর এমন এক কাল ছিল যখন কোনও ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন জীব এ জগতের সাক্ষীরূপে উৎপন্ন হয় নাই ; আর এখনও একের পর এক এই জীবসকল উৎপন্ন হইয়া নষ্ট হইতেছে ;—তবে এই জগতের প্রতিষ্ঠা কোথায় ?

গীতা এই প্রশ্নের উত্তরে কহেন—এ জগৎ যুগযুগান্ত ধরিয়া আছে, অনন্তকাল হইতে ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিতেছে,—সুতরাং এই যুগযুগান্ত ধরিয়া এই অনন্তকাল হইতে, এমন এক স্থির, ধীর, নিত্য, অবিনাশী সত্তা বা জীব অবশ্য ছিল ও আছে, যাহার ইন্দ্রিয়শক্তিতে এই জগৎ-প্রবাহ নিত্যকাল ধৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই যে নিত্য, অবিনাশী জীব, তাহাকেই ভগবান গীতায় আপনার পরা-প্রকৃতি কহিতেছেন।

এত গেল কমবেশী অনুমানের কথা। এই যে জীব ইহার সাক্ষাৎ অনুভব আমাদের আছে কি, হয় কি, হওয়া সম্ভব কি ? কেবল সম্ভব নহে, কেবল হয় না, নিত্যই আমাদের এই জীবের অপরোক্ষ অনুভব হইতেছে। কেবল তাকাইয়া দেখি না, তাকাইয়া বুঝি না বলিয়াই আমরা এই অনুভবের মর্ম্ম ও মর্যাদা জানি না।

ইহা বুঝিতে হইলে, সকলের আগে আমাদের জীব-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে একটা অতি সাধারণ ও অতি মোটা ভ্রান্তি আছে, তাহার নিরসন করা প্রয়োজন। জীব বলিতে আমরা নিজেদেরে বুঝি। আমরা যে

জীব, এবিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-আমরা জীব, সে-আমরা যে কি, এবিষয়ে আমাদের অনেক সময় পরিষ্কার ও সত্য ধারণা জন্মে না বা জন্মিলেও থাকে না, এইজন্যই এই ভ্রমে পড়িয়া থাকি।

প্রথমতঃ "আমরা" বলিতে অনেক সময় এই দেহকে বুঝি। এই দেহটাই আমি, এই প্রত্যয় অতি সাধারণ, একরূপ সার্ব্বজনীন বলিলেও চলে। এই দেহেতে আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়সকল অধিষ্ঠিত। এইজন্য শাস্ত্রে এই দেহকে "অধিষ্ঠান কহিয়া থাকেন। যে ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে আমাদের এই জগতের যাবতীয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, যাহার মধ্যে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ ও সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের বস্তুজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়েরই প্রকাশ হয়, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এই দেহ। এই দেহ গেলে ইন্দ্রিয় যায়, ইন্দ্রিয় গেলে বিষয় যায়, বিষয় গেলে বিষয়ীও যে যায় না, ইহা কে বলিবে? আমরা বিষয়ী বা জ্ঞাতারূপেই নিজেদেরে আত্মবস্তু বলিয়া জানি। সুতরাং এই আত্মজ্ঞানের আশ্রয় এই দেহ, এই বোধ সহজেই জন্মিয়া যায়। কিন্তু এই দেহ যদি আমাদের আমি হয়, ইহাই যদি আমাদের জীবত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এই দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবত্বের উদ্ভব আর এই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবত্বের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হয়। সে অবস্থায় এই জীবত্বের দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে, অমন কথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। কারণ এই জগৎ আমাদের চক্ষে ত অনাদি ও অনন্ত। আর একদিন এই জগৎ ছিল না, পরে উৎপন্ন হইয়াছে,—

না ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি
ঘোর দিগন্ত প্রসারী
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিতে,
জয় জয়, মহিমা তোমারি,—

এইরূপে কালবিশেষে ভগবানের ইচ্ছা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে—একথা সত্য হইলেও, সেই কাল-বিশেষ যে কবেকার,

তাহা আমাদের কেবল অপ্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু কল্পনারও একান্ত অতীত। আমাদের কেবল নিজের জন্মের পূর্ব্বে নয়, কিন্তু জগতে যত জীব দেখি, ও যত জীবের ইতিহাস জানি, ও যত জীবের কথা অনুমান করিতে পারি, তৎসমুদায়ের উৎপত্তির পূর্ব্বেও যে এই জগৎ ছিল, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যে দেহসম্পন্ন জীব, অথবা আমাদের মতন জন্মমরণশীল যে সকল জীব আছে, অথবা জন্মিয়া যেসকল জীব ক্রমে অমর হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া পুরাণাদিতে শুনিতে পাই, এসকলের কাহারও দ্বারা এই জগৎ বিধৃত নহে। গীতা যাহাকে ভগবানের পরা-প্রকৃতি কহিয়াছেন, এই দেহকে আমরা কিছুতেই সেই জীব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

কেবল এই দেহ নহে, আমাদের যে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবত্ব, —পঞ্চতন্মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পর্য্যন্ত যে জীবত্বের প্রভাব ও প্রসার, সেই স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবকেও এই জগতের প্রতিষ্ঠারূপে গ্রহণ করিতে পারি না। এই স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবের যেমন জ্ঞান আছে, তেমনি অজ্ঞানও আছে; যেমন জাগ্রতাবস্থা আছে, তেমনি সুষুপ্তির অবস্থাও আছে; এই জীব যে চেতনাচেতন-ভাব-সম্পন্ন। আমরা যখন ঘুমাইয়া থাকি, তখন আমাদের এই জীব বা আমি যে-জগৎকে ধারণা করিয়া আছে, তাহারও লয় হয়। গভীর নিদ্রাতে যখন আমাদের দর্শনশ্রবণাদি শক্তি আর কোনও কর্ম্ম করে না বা করিতে পারে না, তখন আমাদের শব্দস্পর্শরূপরসময় এই বিষয় জগৎও প্রলয় প্রাপ্ত হয়। নিদ্রাবসানে যখন আমরা জাগিয়া উঠি ও দর্শনশ্রবণাদি পুনরায় নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন এই জগৎ আবার আপনি আমাদের জ্ঞানেতে প্রকাশিত হয়। এই যে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীব, যে জীব কখনও সজ্ঞানে কখনও অজ্ঞানে, কখনও জাগ্রত কখনও সুষুপ্ত, কখনও সচেতন কখনও অচেতন থাকে, তাহা যে

এই অবিরাম জগৎ-প্রবাহকে ধারণ করিয়া আছে, ইহা হইতেই পারে না। সুতরাং ভগবান তাঁহার পরা-প্রকৃতি বলিয়া এখানে যে জীবের কথা কহিতেছেন, সে জীব আমরা নহি। কারণ আমরা সচরাচর আমাদের মধ্যে যে জীবত্ব-জ্ঞান-লাভ করি, তাহা নিত্য নহে, তাহা জন্মমৃত্যুর অধীন। তবে এই জীব কে? এই জীবকে পাইব কোথায়? জানিব কেমনে?

জানিব কেমনে? এই প্রশ্নেতে আমাদের জ্ঞানের যেসকল করণ বা যন্ত্র ও উপকরণ বা বিষয় আছে, তাহাদেরই উপরে দৃষ্টি পড়ে। এই সকল করণ ও উপকরণ লইয়াই আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এইসকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও জ্ঞেয় বিষয় ছাড়া আমাদের কোনও জ্ঞানের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না, হইতে পারে না। এই সকল দরজা দিয়াই যা কিছু জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব, তৎসমুদায় আমাদের জ্ঞানেতে প্রবেশ করে ও প্রকাশিত হয়। বিষয়জ্ঞানেরও এই পথ, আত্মজ্ঞানেরও এই পথ। শাস্ত্র বলি, যুক্তি বলি, কিছুই আমাদের জ্ঞানের এই সার্ব্বভৌমিক পথটিকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন সাধনায় ব্রহ্মজ্ঞানকে পর্য্যন্ত এই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে যে বরুণপুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকটে—"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি"—হে ভগবন আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করুন, এই প্রার্থনা করিলে, বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—অন্ন বা এই বিষয়-জগৎ, প্রাণ, চক্ষুশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, মন, বাক্য—এই সকলই ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। অর্থাৎ গীতায় ভূমিরাপোনলো প্রভৃতি বলিয়া যে বাহিরের বিষয়-রাজ্যের এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার বলিয়া যে অন্তররাজ্যের কথা কহিয়াছেন, আর যে সকলকে তিনি তাঁহার অপরা বা নিকৃষ্টা অষ্টপ্রকারের বিভিন্না প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন,—তৎসমুদায়ই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের দ্বারস্বরূপ। ভগবান যাহাকে তাঁহার পরা-

প্রকৃতি কহিতেছেন, এই দ্বার দিয়াই আমাদিগকে সেই জীবাখ্যা প্রকৃতির মধ্যেও প্রবেশ করিতে হয়। ঐসকল অপরা- প্রকৃতিকে ধরিয়াই এই পরা-প্রকৃতিকে জানিতে হয়। বুঝিলাম। কিন্তু জানিবার উপায় কি?

সে উপায় গীতা আপনি এখানে, এই শ্লোকেই দেখাইয়া দিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বরুণ যেমন আপনার পুত্র ভৃগুকে অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, বাক্য প্রভৃতিই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলিয়া, কি করিয়া এই দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হয়, তার চাবি-স্বরূপ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"—যাঁহা হইতে এই ভূতগ্রাম জন্মগ্রহণ করে; জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে; আর প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে—এই সূত্রটি প্রদান করেন, গীতাও এখানে সেইরূপ— "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—আমাদিগকে তাঁর পরা-প্রকৃতি যে কি, ইহা জানিবার জন্য এই সূত্রটি দিয়াছেন। "যাঁহার দ্বারা আমি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছি"—এই চাবি দিয়াই ভগবানের এই জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতির নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে।

দেখিয়াছি যে জগৎ অর্থই চঞ্চল প্রবাহ। যাহা কেবল চলিয়া যাইতেছে, তাহাই জগৎ। যাহা কেবল চলিয়া যাইতেছে, সরিয়া যাইতেছে, একের পর আর ছুটিয়া আসিয়া বিদ্যুৎচমকের মতন চমকাইয়া আবার সরিয়া পড়িতেছে, তাহাকে ধরি কেমন করিয়া? ধরিতে গেলেই ত তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে হয়। আটকাইয়া রাখিলে বা রাখিতে পারিলে তার গতি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা আর প্রবাহরূপে থাকে না। এক কথায় তাহাকে আর জগৎ বলিতে পারি না। সেরূপ করিলে বা করিতে পারিলে জগতের জগতত্ব নষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে আর "ধার্য্যতে জগৎ"— জগতকে ধারণ করা বলিতে পারি না। জগৎকে জগৎ রাখিয়া ধারণ করিতে হইলে, এমন করিয়া ধরিতে হইবে যে তাহাতে ধরা পড়ি-

য়াও তার প্রবাহ, তার গতি, তার পরিবর্ত্তন-ও পরিণাম, বন্ধ হইবে না, নষ্ট হইবে না। যেমনটি ছিল তেমনটি থাকিয়া যাইবে। ধরা থাকিবে, অথচ চলিতেও থাকিবে, বাঁধা পড়িবে অথচ গতিরোধ হইবে না, এ অসম্ভব সম্ভব হয় কিসে?

ইহা সম্ভব হয় জ্ঞানেতে। আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত এটি প্রমাণ করিতেছে। এই যে "করিতেছে" বলিলাম, ইহাতেই এই কথা প্রমাণ হয়। এই "করিতেছে" কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি ত। ইহা একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। এই ধ্বনিগুলি একই সঙ্গে যুগপৎ ধ্বনিত হয় না। একটির পর একটি ধ্বনি উচ্চারিত হয়। আর একটি ধ্বনি কাণে বাজিয়া লয় না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহার পরের ধ্বনিটি শ্রুতিমূলে প্রবেশ করে না। ক+রি+তে+ছে—এই ভাবে চারিটি ধ্বনি একের পর এক ধ্বনিত হইয়া, শেষটি যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখনই ইহাদের সমষ্টিভূত যে "করিতেছি" শব্দটি, তাহা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। প্রশ্ন এই—এই চারিটি বিশিষ্ট ধ্বনিকে কে ধরিয়া রাখিয়া, ইহাদের সমষ্টিভূত যে করিতেছি শব্দ সে শব্দের বোধ বা ধারণা সম্ভব করিতেছে? আমরা ইহাকে ধৃতি বলি। চঞ্চল, ক্ষণিক, নিয়ত-কম্পিত ও প্রবাহিত যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা sensation, ইহাকে যাহাতে ধরিয়া রাখে ও ধরিয়া রাখিয়া আমাদের যাবতীয় বিষয়-জ্ঞান সম্ভব করিতেছে, তাহাই ধৃতি। ইহাকে স্মৃতিও বলিতে পারি। ইহাতেই যাবতীয় জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এই জন্য ইহাকে বিজ্ঞান বা consciousness of self'ও বলা যায়। এইটি আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়বোধের সাক্ষী। ইহাই বাস্তবিক আমাদের অন্তরস্থিত সাক্ষী-চৈতন্য। পরিবর্ত্তনের যে সাক্ষী দেয় সে আপনি পরিবর্ত্তনের অধীন হইতে পারে না। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনি যদি পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, তবে তার পক্ষে পূর্ব্বে কি ছিল আর এখন কি হইয়াছে, কত কি গিয়াছে, কত কি আসিয়াছে, কত কি আছে, কত কি আসিতেছে,

—এ সকল কথা বলা অসম্ভব। কৃষক ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। সেই বীজই যে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া গাছ হয়, তার সাক্ষী সে গাছেতে ত নাই, আছে ঐ কৃষকের স্মৃতিতে বা জ্ঞানেতে, কারণ সে ঐ গাছের বীজও দেখিয়াছে, সেই বীজ ক্রমে ক্রমে নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনকার গাছরূপে পরিণত হইয়াছে, ইহাও দেখিয়াছে ও দেখিতেছে। বীজ আপনি পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়াছে বলিয়া, এই গাছ যে তারই পরিণাম, একথা জানে না। অথবা বীজ একথা জানে, অমন কল্পনা যদি করি, তবে ঐ বীজের অন্তরে, তার নিগূঢ়তম সত্তার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা আপনি পরিবর্ত্তিত না হইয়া, কেবলমাত্র বীজের বাহিরের আকারাদির পরিণাম তিলে তিলে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, এরূপ একজন সাক্ষী আছেন, একথা স্বীকার করিতে হয়। বীজ আপনার জীবন-কথা আপনি জানে কি না, এ বিষয়ে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ বা প্রামাণ্য জ্ঞান নাই! আমাদের জীবন-কথা আমরা জানি। আমাদের জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তের অশেষ প্রকারের পরিবর্ত্তনের খবর আমরা জানি। আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, দিনে দিনে কি হইতেছি, ইহা দেখিতেছি। আর এসকল অশেষ প্রকারের পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা যে আমরাই থাকিয়া যাইতেছি, আমাদের জীবনের একত্ব, আমাদের নিজেদের ব্যষ্টিত্ব, বিশেষত্ব, বা ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ইহা আমরা জানি, বিশ্বাস করি, বুঝি। এই প্রত্যয় আমাদের বদ্ধমূল। এই প্রত্যয় আছে বলিয়াই আমরা আছি—"অহমস্মি" একথা বলিতে পারি। আর এই প্রত্যয় এমন কিছুর বা কাহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহা অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চঞ্চলের মধ্যে স্থির, প্রবাহের মধ্যেই প্রবাহের অতীত, যাহা দেশকালের মধ্যেই দেশকালের অতীত, যাহা সীমার মধ্যে অসীম, ব্যবহারিকের মধ্যে পারমার্থিক, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত। এই বস্তুকেই আমাদের দেশের শাস্ত্রসাহিত্যে "সাক্ষীচৈতন্য" কহিয়াছেন। আর ইহাই ভগবানের জীবাখ্যা

পরা-প্রকৃতি যাহার দ্বারা এই জগৎপ্রবাহ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

সচরাচর আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" বলি, তাহা জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি নহে। এই জীব-তত্ত্ব কেবল জড়-তত্ত্বেরই উপরে ও অতীতে নহে, কিন্তু আমাদের মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার-তত্ত্বেরও উপরে ও অতীতে। এই কথা বারান্তরে সবিস্তারে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গান

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা,
সইতে নারি বোঝার ভার!
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে ওঠে,
নয়নে হেরি অন্ধকার!

সেই যে শিরে মোহন চূড়া,
সেই যে হাতে মোহন বাঁশী,
সেই মূরতি হেরব বলে
পরাণ বড় অভিলাষী!

বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার,
এস এস পরশ-মাণিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর!